শা র দী য়া

শারদীয়া

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নূতন সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৬৮ শকাব্দ

তিন টাকা
পঁচিশ নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

আনন্দময়ীর আগমনেও যাহাদের কচি বুকে
'বাপের বাড়ি'র বিরহ-বেদনা লাগিয়া থাকে,
"শা র দী য়া" তাহাদেরই দেওয়া হইল

শারদীয়া

আশ্বিন মাস শুরু হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি আছে, তবে সেই যে আক [illegible] ঘিরিয়া পাথরের মত কালো মেঘ…চন্দ্র-সূর্যের দেখা নাই…[illegible]র ঝরঝর অবিরাম বারিপাত সে ভাবটা আর নাই। এখন নানা রকমের সাদা কালো মেঘের স্তূপ লঘু হাওয়ায় ভর দিয়া আ[illegible]কাশে চঞ্চলভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে, মাঝে মাঝে এখা[illegible] ওখানে এক এক পশলা বৃষ্টি, তাহার পিছনেই আবার মে[illegible]ঘের পাশ দিয়া নির্গত দীপ্ত সূর্যের কিরণপাত; বেশ লাগ[illegible] বোঝা যায় খুব ঘটা করিয়া কোন একটা খুব বড় কাজ হইবে, তাই পৃথিবীকে জল-আছড়া দিয়া ধুইয়া মুছিয়া তৈয়ার করিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে। শারদীয়া পূজার আর দেরি নাই। প্রতিমা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছেলের দল মূর্তি ঘিরিয়া জটলা করে, কুমারকে রং রাংতা যোগাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে গল্পও হয়, কুমার কাজে বিরতি দিয়া হুঁকা টানিতে থাকে, আকাশে বাঘ, সিংহ, ময়ূর প্রভৃতি নানা আকারের সঞ্চরমান মেঘে ছেলেদের সুপ্ত কল্পনাকে তোলে জাগাইয়া। বলে, "মনে হচ্ছে যেন সব চলল মাকে নিয়ে আসতে, না গা? ঐ দিকেই তো কৈলেসপুরী, না'গা?"

কুমার বলে, "মনে হচ্ছে মানে? তোমরা কি ভেবেছ নাকি ওগুনো মেঘ? বেচারাদের দূর থেকে মেঘের মত দেখাচ্ছে বলে?…"

শরতের মেঘ গুমগুম করিয়া ডাকিয়া উঠে। কুমার বলে, "ঐ শোন, তাহলে এটাকেও তোমরা মার সিংহীর ডাক বলতে চাইবে না নিশ্চয়? বলবে বাজ পড়ার শব্দ?"

মার সিংহেরই যে ডাক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। মা আসিবেন—আশায়-কল্পনায় শিশু-চিত্ত বিকশিত হইয়া ওঠে।

শুধু কি শি-চিত্তই? ফোটার খবে সমস্ত আকাশ-ধরাতল ওঠে মাতিয়া। কমল তুলিয়া ধরে তালের অঞ্জলি, শিউলি বিছায় সোনাচাঁদির আস্তরণ, স্থলপদ্ম আর করবীর গাছে লাগে রাঙার সমারোহ। কাশের বনে ওদিকে কাহারা চামর গড়ায় মাতিয়া গেছে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে।

মা আসিবেন, আয়োজন প্রায় শেষ। পূর্ণতার প্রসন্ন-হাসি-মুখে ধরিত্রী প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ পঞ্চমী, কাল ষষ্ঠীর বোধন।

সনাতন রায় মোটর থেকে নামিয়া একটু ক্লান্তভাবে ভিতরের ... খুলিয়া দিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিলেন। নিজের হাতেই ফ্যানটা ... একটা সোফায় গা ঢালিয়া দিয়া ডাকিলেন, "কৈ গো, আ... নতুন মা!"

ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেশ একটা বড় মোট পাঁজায় করিয়া আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল। পূজার বাড়ি; ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনে গমগম করিতেছে, দেখিতে দেখিতে মোটটার চারিদিকে সবাই ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সনাতন রায় বলিলেন, "না, এখন খোলা হবে না, তোমরা ঠাণ্ডা হয়ে চারিদিকে দাঁড়াও, আমার মা এসে খুলে যার যেটা ভাগ করে দেবে।" একটি একটু বড়গোছের মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল, তার একটু পরেই একটি ব্রীড়ানত বালিকাকে সঙ্গে করিয়া হাজির হইয়া বলিল, "নিয়ে এসেছি তোমার মাকে বাবা, উনিই এবার পুজোর চার্জে নাকি?"

সনাতন রায় বলিলেন, "ওঁরই বাড়ির পুজো, উনি চার্জে থাকবেন না তো কে থাকবে? আমাদের দুজনের তো এবার ছুটি, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব।" মেয়েটি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল, বোধ হয় সে ভাবটি চাপা দেওয়ার জন্যই কোন রকমে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন ডেকেছেন আমায় বাবা?" শ্বশুর বলিলেন, "ডেকেছি

তোমার কাজ তোমায় বুঝিয়ে দেবার জন্যে। নাও তো মা, পোঁটলাটা খুলে ফেল…

"আচ্ছা, এইবার এক কাজ কর। এর মধ্যে সবচেয়ে তোমার যেটি পছন্দ—কাপড় আর ব্লাউস্ পীস্—আগে আলাদা করে রাখ, তারপর…"

ছেলে-মেয়েরা কাঁইমাই করিয়া উঠিল, সেই প্রগল্ভা মেয়েটি বলিল, "তাহলে তোমার নতুন মা ছেড়ে আমাদের পুরনো মার হাতেই দাও বাবা,—নিজের দিকে ঝোল টানবেন, তিনি নাকি আবার ভাগ করবেন!"

শ্বশুরের কথায় বধূ সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, ননদের এই টিপ্পনিতে এবং সকলের হাসিতে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, তোরা বড্ড জ্বালাতন লাগালি।…আচ্ছা, আমিই ঠিক করে দিচ্ছি মা।"

ঝুঁকিয়া গোটা তিন চার কাগজের বাক্সর ঢাকনা খুলিয়া দেখিলেন। শেষেরটাতে খুব প্রচুর সাঁচ্চার কাজ-করা একটা বেনারসী শাড়ি, আর ব্লাউস পীস্। সেইটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এটা তোমার পুজোর শাড়ি মা, এই পরে পুজোটা সামলাবে।…আর আটপৌরেটা কোথায় গেল?"

আরও দুই তিনখানা বাক্স সরাইয়া একটা টানিয়া লইলেন, ডালা খুলিতে একটা চাঁপার রঙের দামী জর্জেট শাড়ি বাহির হইল। বলিলেন, "এটা কাল ষষ্ঠীর দিন পরে ঠাকুর দেখতে যাবে, আর যখন পুজো ছাড়া অন্য কাজ সামলাবে—চারিদিক তো তোমাকেই সামলাতে হবে কিনা—তখন গিয়ে এইখানা পরে থাকবে। পুজোর কটা দিন যদি সাদা কাপড় পরতে দেখি তো মায়ে-বেটায় একচোট ভয়ানক ঝগড়া হবে…"

মেয়েটি বলিল, "আহা-হা, আমরা যেন ঝগড়া করতে জানি না।…কই বের কর এবার আমাদের ষষ্ঠীর শাড়ি, সপ্তমীর শাড়ি, অষ্টমীর শাড়ি, নবমীর শাড়ি…"

অন্য একটি মেয়ে বলিল, "বিজয়ার শাড়ি।"

অপর একজন বলিল, "না বের কর তো নাতনী-ঠাকুরদায় ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে!" খুব একটা হাসির কলরব পড়িয়া গেল!

মোটরে আসিতে আসিতে মেয়েটি বড় চোখে লাগিয়া গিয়াছিল। সনাতন রায় চর লাগাইয়া খোঁজ লইলেন। টের পাওয়া গেল খুব গরীব পিতামাতার মেয়ে। পিতা মাইনর স্কুলের পণ্ডিতি করেন, আর দু-পাঁচ ঘর যজমান আছে। কোন রকমে চলিয়া যায়। মেয়ে শহরে মামার বাড়িতে আসিয়াছে, বাড়ি-পাড়াগাঁয়ে, হুগলীতে নামিয়া বেশ খানিকটা ভিতরের দিকে যাইতে হয়, গ্রামটার নাম রায়বেড়ে।

বিবাহের কথা পাড়া হইল, কিন্তু মেয়ের বাপের খুব একটা কৃতকৃতার্থ ভাব দেখা গেল না। ঘটক ঠাকুর, সরকার মহাশয় যাহারা গিয়াছিল তাহাদের বলিলেন, "মেয়ে আমার রাজরাণী হবে, এর চেয়ে আনন্দ আর বাপমায়ের কি হতে পারে? তবে আমার অবস্থার দিক দিয়ে দেখতে গেলে একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাই..."

জমিদার বাড়ির সরকার, কথায় ধার থাকে, বলিলেন, "এটা যে অবস্থায় অবস্থায় বিয়ে হচ্ছে না সেটা তিনি খুবই জানেন ঠাকুরমশাই, মেয়ের সঙ্গে তাঁর আর কিছু ঘরে তোলবার অভিপ্রায় নেই।"

ঘটক এই ব্যাপারের ব্যাপারী, লোক চেনে; মেয়ের বাপের মুখে কি একটা লক্ষণ দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "মানে, রায় মশাইয়ের লক্ষ্মীর ঘর, সেখানে মা তো আর কিছুর অপ্রতুল রাখেন নি, তবে মা স্বয়ং আপনার বাড়িতে এসেছেন দেখে তাঁকে নিয়ে যেতে চান আর কি। সরকার মশাই সেই কথাই বলছিলেন। কি সরকার মশাই, এই তো?"

যাহাতে কথা না বাড়ে তাহার জন্য একটু চোখের ইশারা করিয়া দিলেন।

মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তাটাই জয়ী হইল, এরূপ অসম কুটুম্বিতায় আসল বেদনাটা যে কোথায় সেটা প্রকাশ করিয়া বলায় কোন লাভ নাই জানিয়া মেয়ের বাপ আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল।

কথাটা রায় মহাশয় বুঝিলেন। মনে মনে বোধ হয় একটু হাসিলেন। এক সময় বধূকে কাছে ডাকিয়া পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মা, তোমার বাবার ভয় হয়েছে আমি বুঝি তোমায় তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলাম।...চাল-কলা-খেকো ব্রাহ্মণ কিনা মার বাবা, তাই কলাভক্ত জীবটির মত বুদ্ধি।... বাপের কাছ থেকে কেউ মেয়ে কেড়ে নিতে পারে কখনও? তোমার যবে যখন খুশি বলবে মা, সঙ্গে সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা হবে।" বধূর আনমিত মুখটা নিজের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আর এই বুড়ো ছেলেটাকে ছেড়ে যতদিন ইচ্ছে থেক, পারবে তো অনেক দিন ছেড়ে থাকতে?"

বধূ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া মাথা নাড়িল, না পারিবে না।

যে একটা সারা জমিদারী চালাইতেছে, একটি ছোট মেয়েকে বশে আনা তাহার পক্ষে ছেলেখেলা। ফাল্গুনে বিবাহ হইল, বৈশাখের শেষাশেষি বধূ ঘর করিতে আসিল। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সাড়ে-চার মাসের মধ্যে জামাইষষ্ঠীর সময় দিন পাঁচেক গিয়াছিল, জামাই দুদিন আর বধূ নিজে আরও তিন দিন ফালতু। আর যাবার নামও করে নাই, পাঠানও হয় নাই।

না; নামও করে নাই যাওয়ার, আর শ্বশুর এতে আশ্চর্যও হন নাই; কেননা, দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্বে কে যে চিরকাল জয়ী তাহা তাঁহার বিলক্ষণ জানা আছে। বধূর মাথায় যে রায়বেড়ের চিন্তা প্রবেশ করিবে তাহার ফুরসত কোথায়? অর্থের প্রাচুর্যের

মধ্যে একটা নূতন জগৎ দিন দিন চক্ষের সামনে দ্রুত প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার উল্লাস, তাহার বিস্ময়ের সামনে রায়বেড়ে দিন দিনই যেন আরও মলিন হইয়া যাইতেছে। কাছাকাছি তিনটে শহরের বায়স্কোপ, কি আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড সব! কখন শখের থিয়েটার, কখন সার্কাস। বায়স্কোপের সমস্ত বড় বড় নামগুলা তাহার মুখস্থ হইয়া গেছে; এবার বাপের বাড়ি গিয়া সবাইকে বলিল। তাহারা হাঁ করিয়া শুনিতেছে, শুধু সেই জানে বলিয়া এমন একটা আনন্দ হয়!...মোটরে করিয়া জজসাহেবের মেয়েরা বেড়াইতে আসে—শীলা, ওদের বউ। ওদের মোটরের শব্দ হইলেই ঠিক রং মিলাইয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া আসিতে হয়; এত বোঝে, বিশেষ করিয়া শীলা।...আবার ননদের সঙ্গে মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া আছে জজের বাড়ি, সরকারি উকিলের বাড়ি, ডেপুটিদের বাড়ি, আরও কত সবার বাড়ি। সবারই বাড়িতে মোটর গাড়ি।...কাহার কি গাড়ি সে জানে।...যেখানেই যায় প্রায় প্রথমেই তাহার রূপের প্রশংসা। এমন একটা সলজ্জ আনন্দ মেশান!....বড়রা রায়গিন্নীকে বলে, "এখনও বড় ছেলেমানুষটি তাইতেই এত রূপ, একটু বড় হলে বৌ তোমার যা হবে!..." শীলা বলে, "বৌ, তোকে দেখে আমার কি মনে হয় জানিস?" অনেকবার শোনা কথা। বধূ বলে, "জানি, তোমার আর বলতে হবে না।" দুজনের মধ্যে খুব চাপা হাসি চলে।

এসবের অতিরিক্ত আছে বাড়ির আদর। ননদ দুইটির আদর একটু মিঠে-কড়া গোছের, বেশ লাগে। শ্বশুর বধূ-অন্ত প্রাণ, নিজেকে একেবারে বধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা—"কৈ গো, নতুন মা আমার?" ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহস্থালির এদিককার প্রায় সব কাজই বধূর হাতে। সাজান-গোছান তো আছেই, দেওয়া-থোওয়া, আদর-অভ্যর্থনায়ও তাহার কাজ কম নয়, কিন্তু শ্বশুরের ডাক পড়িলেই সব ছাড়িয়া সদ্য সদ্য আসা চাই। নিজের অন্তরের তাগিদও আছে, অভিমানেরও

ভয় আছে অসহায় শিশুর মতোই যে একেবারে চরমভাবে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহার অভিমান সত্যই প্রাণে বড় লাগে।

মাঝে শ্বশুর একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা তুলিয়াছিলেন নিজে থেকেই। তবে জমিদারী পদ্ধতিতে। কয়েকদিন আগে কি করিয়া খোঁজ পাইয়াছিলেন শীলার হাতের একেবারে হালফ্যাশানের চুড়ি দেখিয়া বধূ প্রশংসা করিয়াছিল। সেই রকম চুড়ি যেদিন গড়া শেষ হইল, বধূকে ডাকিয়া পাশে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "ছেলের সাধ হয়েছে মা একটু····এইগুনো পরে ফেল দিকিন। কলকাতায় গিয়েছিলাম—রায়েদের দোকানে চুড়িগুনো দেখে বড় চোখে লাগল। এসে গণেশ স্যাকরাকে ফরমাশ দিয়ে দিয়েছিলাম, আজ দিলে।···· তোমার ভাল লাগবে কিনা জানি না, কিন্তু তবুও পর, ছেলেরও তো একটা সাধ আছে···"

বধূ চুড়ি পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হল পছন্দ আমার মার ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, ভীমরতি ! বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, বেহাই লিখেছেন, 'অনেকদিন আসেনি অনু, একবার যদি পাঠিয়ে দেন।'···কি লিখব ? অবশ্য বুড়ো ছেলেটা তোমার কি করে থাকবে সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না।···তাহলে লিখে দিই যে···"

বধূর বুকটা একটু কি রকম করিয়া ওঠে, বাবা নিজে লিখিয়াছেন ···বাবা, মা, খোকা, বাড়ি সব বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। নূতন চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তাহার পর বলে, "লিখে দিন এ কটা দিন যাক, তারপর যাব বাবা···"

শ্বশুর হাসিয়া বলেন, "দেখ বোকা মেয়ের বুদ্ধি ! আমি লিখলে বাবা কি ভাববেন ?"

বধূ বলে, "আমি দোব'খন লিখে বাবা।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়াই বলে, তাহার পর একটা ছুতার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলে, "লিখে দোব, ঠাকুরঝিকে দেখতে আসবে, সেটা হয়ে যাক, তারপর। অ্যাঁ বাবা ?"

ঐশ্বর্য আর জমিদারী মগজের বিজয়ে সনাতন রায় হাসেন।

সত্যই বিজয়-পরাজয়ের কথা। মেয়ের হাতেই দুইখানি এই ধরনের পত্র পাইয়া বাবা আর পাঠানর কথা লেখেন না। সে যে কী নিদারুণ, নবৈশ্বর্যশালিনী কন্যার কাছে সে সংবাদ কেহ পৌঁছাইয়া দেয় না। নিরীহ বালিকাও বোঝে না কিছু।

গরীবের মেয়ে রাজপ্রাসাদে গেলে তাহাকে যে তাহার পূর্ব-জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তাহার মধ্যে সব সময়েই যে দারিদ্র্যের প্রতি একটা ঘৃণা-অবহেলার ভাব থাকে তাহা নয়। অনেক সময় থাকে একটা ঈর্ষার ভাব ; যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায় তাহাকে একেবারে নিজের করিয়া, আলাদা করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা সহজ নয়, কেননা, দারিদ্র্যেরও একটা আবেদন আছে, নিজের বুকের স্তন্য দিয়া যে-দারিদ্র্য এতদিন মানুষ করিল। সেইজন্য অর্থকে নিজের মায়া, নিজের মোহ পূর্ণতমভাবে নিয়োজিত করিতে হয়।

সনাতন রায় জানেন বিজয় তাঁহার প্রায় করায়ত্ত ; দারিদ্র্যকে মাত্র আর একটি আঘাত দিলেই হয় এবার।

সামনে পূজা, এর আড়ম্বরটা এবার দ্বিগুণ করিয়া দিলেন।

প্রায় মাস খানেকেরও পূর্বে থেকে বাড়িটাতে সাড়া পড়িয়া গেল। এবারে একটা আরও সুযোগ যে চারদিন পূজা। বৃহৎ অট্টালিকা মেরামত করিয়া চুন-রঙ ধরানোর কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ আর বাড়ির মধ্যে যেটুকু খালি জায়গা ছিল সেখানে নূতন ভাঁড়ার তৈয়ার করিয়া মহাল থেকে দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। কলিকাতা থেকে থিয়েটার আসিয়া দুই দিন অভিনয়

দিবে, একদিন এখানকার শখের পার্টি, একদিন কলিকাতার বায়স্কোপ। শহরের কাছাকাছি চারিটি পাড়া চার দিন খাওয়ান হইবে।···দিন পনর পূর্বেই বাড়ি কুটুম্ব-সাক্ষাতে ভরিয়া গেল। নূতন বধূর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। হয় শাশুড়ী, নয় শ্বশুরের সঙ্গে, নয় একলাই তদারক করিয়া ফিরিতেছে। কটা দিনেই দায়িত্বের চাপে যেন কত বয়স বাড়িয়া গিয়াছে।···নূতন জীবনের মধ্যেও এ একটা নূতনতর ব্যাপার। রায়বেড়ের কথা মনে পড়ে কি? কর্ম-উন্মাদনার ক্ষণিক অবসাদের মধ্যে পড়ে বোধ হয় কখনও কখনও···বাবা আসিয়া অর্ধ-মলিন জামাটা আলনায় টাঙাইয়া রাখিলেন। বলিতেছেন, "অনু, পিঠের কাছটা একটু সেলাই করে রাখিস তো।" মা রাঁধিতেছেন, অনু বসিয়া গল্প করিতেছে, খোকা আসিয়া বলিল, "বাগান থেকে ছুটো বেগুন তুলে আনলাম মা, নতুন হয়েছে···দিদির জন্যে ভেজে দিও মা...তোর এখন কষ্ট হয় এখানে খেতে, না দিদি?" মা বলিলেন, "তাই কি হয় রে পাগল? বাপের বাড়ির ভাত শুধু নুন দিয়ে খেলেও তার স্বদ আলাদা।···দেখিস না, কুবেরের ভাণ্ডার ছেড়ে মা-দুর্গাকে কেমন করে ছুটে আসতে হয় বছর বছর?"

কেমন সব আবছায়া ছবির মত...বায়স্কোপের এক একটা খণ্ড ছবি যেমন অর্ধেক ফুটিয়াই মিলাইয়া যায়। নূতন কর্মের মাঝে সব আবার মুছিয়া মিলাইয়া যায়।

শরতের রূপ, হালকা মেঘ থেকে এক পশলা বৃষ্টি মাটিতে পৌঁছিবার আগেই মেঘ যায় মিলাইয়া, দীপ্ত সূর্যের উল্লসিত আলোকে আকাশ যায় ভরিয়া।

শ্বশুর আসিয়া বলেন, "বেহাই লিখেছেন, অনেক দিন চিঠি পান নি তোমার···"

স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া বধূ বলে, "এই একটু ফুরসত হলেই লিখে দোব বাবা, খবর দিয়ে দিন বাবাকে।"

ঈর্ষা নিজের বিজয়ে গোপনে হাস্য করে। দারিদ্র্যের শেষতম বন্ধনটি ছিন্ন হইতে চলিল।

ঈর্ষা যে নিজেই একটা পরাজয় এ-তত্ত্ব তাঁহাকে কে বুঝাইবে ?

ষষ্ঠীর দিনটা যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল নববধূ বুঝিতেই পারিল না। আনন্দের ক্লান্তি আর অবসাদের মধ্যে যখন শয্যাগ্রহণ করিল তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। মনটা কেন, কি করিয়া যেন একটু বিষণ্ণ, কিন্তু সে বিষাদকে 'ভাল করিয়া বুঝিবার, অনুভব করিবার পূর্বেই, বোধ হয় সপ্তমীর পূজার উগ্রতর আনন্দের কল্পনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

আনন্দের ঔৎসুক্যে রাত্রে বোধ হয় ভাল করিয়া ঘুমও হয় নাই, খুব ভোরে উঠিয়া নববধূ আবার আয়োজনে মাতিয়া গেল। বোধনের বাজনায়, কর্মের ক্রমবর্ধমান কোলাহলে; ছেলেদের উৎসব-কাকলিতে তাহাকে যেন গোড়া থেকেই একটা অদ্ভুত উন্মাদনায় ঘিরিয়া ফেলিল। বোধ হয় শ্বশুরের অত্যধিক আদর আর নির্ভর-তার জন্য তাহার মনে হইল সব ব্যাপারটা তাহাকে ঘিরিয়াই হইতেছে। চারিদিক থেকেই একটা আনন্দের ঢেউ একরকম দুর্বার উচ্ছ্বাসে তাহার মনের তটে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্বশুর আসিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কৈগো মা, ঠাকুর যে ওদিকে এসে গেলেন, তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন··· বরণ করে নেবে চল···"

বধূ স্নান করিয়া নূতন বেনারসী শাড়িখানি পরিয়াছে, পিঠে কুঞ্চিত কেশরাশি এলান, সিন্দূরবিন্দু দিবার জন্য আরশির সামনে দাঁড়াইয়া সোনায়-হীরায় ঝলমল কোন্ এক দেবকন্যাকে দেখিয়াই যেন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের ডাকে একটু ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ভ্রূমধ্যে সিন্দূরবিন্দু বসাইয়া কতকটা জড়িত পদে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূর অপূর্ব স্নিগ্ধ রূপে শ্বশুর মুহূর্ত মাত্র নির্বাক হইয়া রহিলেন, তাহার পর তাহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়া 'বলিলেন, "দেখতো! আমার এ মা গিয়ে বরণ করে না নিলে ও মা'কি সিংহের পিঠ থেকে নামতে পারেন? চল এবার।"

শ্বশুরের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিতেই নববধূ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরকম কিছু এর পূর্বে দেখে নাই…না এরকম প্রতিমা, না এরকম বেদীসজ্জা, না এরকম আলোক, না এরকম পূজাসম্ভার। এক কল্পনাতীত ব্যাপার।…এসব তাহার… তাহার সঙ্গে এসবের কোথায় একটা অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে…এ-ঐশ্বর্য, এ-পূজা…এমন কি অন্য সব দেবতার চেয়ে শতগুণে ঐশ্বর্যময়ী এই দেবতাও তাহারই।…তাহার আসাতে সকলে যেমন ক্ষণিকের জন্য নির্বাক, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সেও সেই রকমই এই ঐশ্বর্য-সমারোহের সামনে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভিতর থেকে কি-যেন একটা ঠেলিয়া আসিতেছিল। আনন্দই, কিন্তু অশ্রুর সঙ্গেও সম্বন্ধ আছে।

শ্বশুর ঐশ্বর্যের বিজয়ে অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইলেন ; দূর পল্লীর কোনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া মনের কোথায় একটি হাসি ফুটিল বোধ হয়। মনে মনে বধূকে বলিলেন, "এ গণ্ডির বাইরে তুমি আর কি করে যাবে মা ?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "নাও, এবার তোমার পুজোর যোগাড়ে নেমে পড় মা। চন্দন ঘষবে ? না নৈবিদ্যি সাজাবে ? তুমি বরং গিয়ে ঐ সোনার পরাতটাতে নৈবিদ্যিই সাজাওগে।"

বধূ নৈবেদ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। আবার শ্বশুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া মুখটি তাহার বুকে গুঁজিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, ফুল আছে আর বাগানে ? আমি আরও তুলে নিয়ে আসব।"

বধূ চলিয়া গেলে পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি চাও শিশুকে একদিনেই গিন্নী করে তুলতে সনাতন, তা কখনও হয় ?"

সনাতন রায় বলিলেন, "মা আমার গিন্নীই হয়ে উঠেছেন, পুরুত মশাই। তবে আজকের কথা আলাদা, আজ জগতের সবচেয়ে পাকা গিন্নী মা-অন্নপূর্ণাই যখন শিশু হয়ে বাপের বাড়ি ছুটে এসেছেন…"

কথাটা নিজের বুকেই ধক্ করিয়া একটা আঘাত দিল ; আর

শেষ করিতে পারিলেন না। অনেকে খোশামোদে, অনেকে সত্যই একটা উঁচু দরের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া সাধুবাদ দিল। একটু আলোচনা চলিল কথাটা লইয়া। সনাতন রায় কেমন যেন অন্য-মনস্কভাবে।একটু এদিক ওদিক করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে ভিতর বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

খিড়কির সঙ্গে বেশ উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা একটা মাঝারি গোছের বাগান। মাঝখানে একটা ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী, চারিদিকে ফল ফুলের গাছ···এটি বাড়ির মেয়েদের জন্য। বধূর সঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে আর ছেলে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে ফুল তুলিবার জন্য আসিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দুই-এক জন তাহার সঙ্গেই রহিল।

এদিকে কাজ-কর্মের ঝোঁকে প্রায় মাসখানেক বাগানে আসা হয় নাই। নিত্য পরিচয়ের মধ্যে এই ব্যবধানের জন্য গাছপালা, পুকুরের জল, এমন কি এখানের রোদটুকুকে পর্যন্ত যেন নূতন বলিয়া মনে হইল। প্রকৃতপক্ষে আসিয়াছেও নূতনত্ব কিছু কিছু। পুকুরের কুঞ্চিত, চিক্কণ বুকের উপর একদিকে কতকগুলো সাদা সাদা কহ্লার ফুটিয়াছে, মাঝখানে গোটাকতক পদ্ম, তাহাদের পাতার উপর হাওয়ার দোলে জলের গোটাকতক বড় বড় বিন্দু গড়াইয়া ফিরিতেছে, রায়বেড়ের চৌধুরীদের মজা পুকুরধার মনে করাইয়া দেয়। তফাত এই, সেটা একটা আদত পদ্মবন, এখানে গোটাকতক মাত্র ফুল—পুকুরকে সাজাইয়া রাখা।··· ননদ বলিল, "বাবা কলকাতার নার্সারি থেকে এনেছিলেন···এই সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে।" বধূ বলিল, "আমরা পুজোর সময় তুলতাম কোঁচড় ভরে। আমার ভাই খোকা খুব সাঁতার কাটতে জানে কি না···"

ননদ আলাদা করিয়া নাম দিয়াছে, প্রশ্ন করিল, "আর বুনী বুঝি নিজে জানে না? সুকোন হচ্ছে!"

বধূ ঘাড় কাত করিয়া হাসিল, বলিল, "জানতুম, এখন ভুলে গেছি।"

একটি ছেলে বাহাদুরি দেখাইয়া সামনে আসিয়া বলিল, "আমিও জানি সাঁতার, নিয়ে আসব তুলে ?"

ননদ বলিল, "আন না, ইচ্ছে হয়েছে বৌদির।"

বধূ কি মনে ভাবিল। তাহার যেন মনে হইল চৌধুরীদের মজা পুকুরের পদ্ম-তোলা আর এখানকার পদ্ম-তোলায় কোথায় একটা তফাত আছে। এ পুকুর তাহার নিজের কিন্তু আজ কেন যেন বোধ হইতেছে চৌধুরীদের পুকুরের চেয়ে আরও দূর আরও অনাত্মীয়। সাজি দুলাইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "না থাক।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে কিছু দোপাটি তুলিল, কিছু রজনীগন্ধা।....এ দুইটা ফুল তাদের বাড়িতে আছে। উঠানের দক্ষিণ কোণটাতে প্রত্যেক বৎসর কৃষ্ণকলি আর দোপাটি আপনি জন্মিয়া গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হইয়া ফুটে। প্রত্যেক বৎসরই বাবা অনু আর খোকাকে দিয়ে চৌধুরীদের বাড়ির পূজাতে পাঠাইয়া দিতেন, বলিতেন, "আহা, দিয়ে আয়, যত্ন নেই আত্তি নেই, ওরা মায়ের পুজোর জন্যে প্রতি বচ্ছর আপন মনেই ফোটে···।" আর বৎসরও ঠিক এই আজকের দিনের এই সময়টা ফুল লইয়া গিয়াছিল···যেন দেখা যায়···শীতলার মার উঠানের উপর দিয়া যাইতেছে দুজনে খুব জোরে···খোকা তাহাকে হাঁটায় হারাইয়া দিবার জন্যে একেবারে ঝুঁকিয়া গিয়াছে সামনের দিকে···রেষারেষির ঝোঁকে দুজনেই এক একবার হাসিয়া উঠিতেছে···খোকার নূতন কাপড় কোমর বাঁধিয়া পরা···কোঁচড় ফুঁড়িয়া কৃষ্ণকলি আর দোপাটির আভা বাহির হইয়া আসিতেছে।··· আজও খোকা সেইখান দিয়া যাইতেছে—যেন দেখা যায়। একটু যেন মনমরা···ভাবিতেছে, আর বছরে দিদি পাশটিতে ছিল!···

বাগানের শেষ দিকে একটা বাঁধান চত্বর, তাহার চারিদিকে শিউলি গাছ। ননদ ডাকিল, "বৌদি, দেখসে, কি কাণ্ড! চাতালটা বোঝাই হয়ে রয়েছে ফুলে, এরা নিয়ে যায় নি নাকি কুড়িয়ে ?"

বধূ একটু মন্থর গতিতে গিয়া চাতালের উপর থেকে কিছু শিউলি সঞ্চয় করিল, তাহার পর সাজিটি পাশে রাখিয়া বসিয়া পড়িল। ননদ বলিল, "ছুটো দোপাটি তুলেই শখ মিটে গেল? বুনী আর কেন বলেছে?"

শিউলি শেষ করিয়া উহারা ফুলসঞ্চয়ে বাগানে ছড়াইয়া পড়িল। বধূ বলিল, "আমি একটু বসি।"

কি হইয়াছে···আজ এই আলোয় ছায়ায় ঝলমল দিনটাকে যেন বহু বৎসরের চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। এতক্ষণ হয় নাই, তিন মহল বাড়ির বাহিরে যে এমন একটা সখীর মত পরিচিত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে, এটা ধারণার মধ্যেই আসে নাই। এই চেনা দিনের নানা ব্যাপারের মধ্যে এখানকার পূজা, এখানকার জীবনের কোন অংশই নাই। চৌধুরীদের বাড়ির পূজার কাঁসর ঘণ্টা···কোঁচড়ভরা কৃষ্ণকলি, দোপাটি...পূজামণ্ডপের সামনে ছেঁড়া চাঁদোয়ার তলায় যাত্রার আসর সাজানর আয়োজন···দেবদারুর কোঁচকান পাতা····রঙীন কাগজের শিকলি, পতাকা····মা বাবার চণ্ডী পাঠের যোগাড় করিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পেলে স্কুল থেকে কিছু আগাম? আজ বছরকার দিন ছেলে-মেয়েটাকে··· চৌধুরীদের বাড়ির নেমন্তন্ন···সে তো পরশু···"

পূজার নহবৎ ভাসিয়া আসিতেছে···শ্বশুর কাশী থেকে আনাই-য়াছেন। কত দূরের একটা অপরিচিত সংগীত কাদের বাড়ির··· রূপকথায় শোনা কোন রাজপুরীর। পূজার বাজনা নয়, সাত মহালের মাঝে মণি-প্রবালের ঘরে বন্দিনী রাজকুমারীর কান্নার সুর···

বধূ একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সাঁচ্চার কাজ-করা শাড়ির অঞ্চলটা দিয়া চক্ষু মুছিল।

সনাতন রায় নিজের ঘরে একটা হেলান চেয়ারে শুইয়াছিলেন।··· নিজের সেই তুইটা কথার আঘাত নিজেকেই বড় বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে···কি করিয়া সব যেন বিস্বাদ ঠেকিতেছে···কেন, কে জানে···

দুয়ার ঠেলিয়া পুরোহিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন, ভাবটা খুব উদ্বিগ্ন। বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে এসে বসে আছ? খুঁজছিলাম তোমায়!"

সনাতন কতকটা নির্বিকারভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পুরোহিত কতকটা শংকিত উদ্বেগের সঙ্গে বলিলেন, "মা আসেন নি, সনাতন! কোথায় কি হয়েছে খোঁজ নাও। ওরকম করে চেয়ে রইলে যে? বিশ্বাস হচ্ছে না? যদু সার্বভৌমের সন্তান···সাত পুরুষ ধরে মায়ের পায়ে মন্ত্র পড়ে ফুল দিয়ে আসছি, মায়ের পায়ে পড়ছে, কি খড়মাটির প্রতিমার পায়ে পড়ছে বুঝতে পারি। মা আসেন নি। অবশ্য পুজোর লগ্ন হয়েছে···খড়মাটিকে সাক্ষী করে মন্ত্র আওড়াতে হবেই···রামগতিকে তন্ত্রধারী করে বসিয়ে এসেছি, কিন্তু বুঝছি সব শুষ্ক, নিরর্থক। সনাতন, শুয়ে থাকলে চলবে না; ওঠ। তুমি বিশ্বাস করবে না বলে সব কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না···কিন্তু সার্বভৌমের সন্তান পুজোর দিনে পুজো করাতে করাতে উঠে এসে মিছে কথা বলবে না; মায়ের পুজোর ফুলে আমি গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছি না···হতে পারে মনের ভ্রম···কিন্তু মা যে আসেন নি, প্রতিমার যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে···"

সনাতন রায় কতকটা নির্বিকার ভাবেই শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "অবিশ্বাস করব কি করে? আমি নিজেই যে মায়ের বাপের বাড়ির পথ আটকে রেখেছি পুরুতমশাই। একটু দর্প হয়েছিল। মেয়েকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম তার বাপের কাছ থেকে, তার মায়ের কাছ থেকে।····আমার নতুন মা কোথায়? রতি এসে বললে বাগানে বসে আঁচলে চোখ মুছছেন।···ললিত নিজে গিয়ে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে আসুক।··· বুঝতে পারি নি পুরুতমশাই, কোন্ মেয়ের বুকের ব্যথা যে কোন্ মেয়ের বুকে বাজবে, অতটা আন্দাজ করতে পারি নি···অপরাধ হয়ে গেছে।"

অভিভাবক

ব্যারিস্টার এস্. কে. ড্যাট্ ক্লাব হইতে একটু রাত করিয়াই ফিরিলেন। মোটর হইতে নামিয়া বেয়ারাকে প্রশ্ন করিলেন "সে সম্বন্ধী এসেছিল আজও,—সেই ইনশিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্টটা ?"

ক্লাবের ফেরত স্বরটা একটু জড়িত এবং মেজাজটা একটু চড়া পর্দায় বাঁধা থাকে ; আর ঠিক যে 'সম্বন্ধী' কথাটাই ব্যবহার করিলেন তাহা নয়। যেটা ব্যবহার করিলেন সামাজিক ভাষায় তাহার মানে হয়, সম্বন্ধী। আমরাও এই কথাটাই চালাইব।

বেয়ারা বলিল, "আজ্ঞে না, সে আজ আর আসে নি।"

সিধা হইয়া সামান্য ঢুলিতে ঢুলিতে বলিলেন, "সো মাচ্ দি বেটার্ ফর্ হিম্। এবার এলে জিজ্ঞেস করবি তার নিজের লাইফ-ইনশিওর করা আছে কি না।"

"যে আজ্ঞে হুজুর।"

"কেন ? হোয়াই ?"

বেয়ারা উত্তর দিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। ড্যাট্ সাহেব তাহার বুকের কাছে তর্জনীটা লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "যেহেতু তাহার অভ্যর্থনার জন্য কল্য হইতে আমার ব্লডহাউণ্ড লীয়ন্‌কে খুলিয়া রাখা হইবে।...বলে দিবি।" বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

বারান্দার একপাশে মক্কেলদের বসিবার ঘর। পর্দা সরাইয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া বেয়ারা বলিল, "ও হবে না বাবু, শুনলেন তো ? ক্রমে বেশি রকম খাপ্পা হয়ে উঠছেন, কোন্‌দিন খেয়ালের

মাথায় কি একটা করে বসবেন....এমনি তো সাহেব খুব ভাল, তবে...”

“তাই দেখছি”—বলিয়া একটি ছোকরা বিষণ্ণভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। পর্দার ফাঁকে বাহিরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “চলে গেছেন ওপরে, না ?”

বারান্দায় আসিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া নামিয়া গেল। বেয়ারা সিকিটা বিদ্যুতের আলোয় ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ছোকরাটির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কালও আসবেন না কি বাবু ? আরে খাপ্পা হয়ে তো আর খুন-জখম করবে না...অত ভয় করলে কি কাজ চলে ?”

ছোকরা একটু দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বলিল—“ঠিক বলতে পারছি না বাপু, তবে সম্ভবত নয়। যদি আসিই তো তুমি তোমার চার-আনি থেকে বঞ্চিত হবে না।” বলিয়া একটু হাসিল।

প্রুডেনশ্যাল ফ্যামিলি ইনশিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট। আজ চার দিন হইতে যাওয়া-আসা করিতেছে, কিন্তু সুবিধা হয় নাই। প্রথম দিন সামান্য মিনিট দশেক ধরিয়া একটু কথা কহিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে নিজের প্রস্‌পেক্টাস্‌টা বুঝাইতে কুলায় নাই। ইহার পর আদৌ বীমা করিবার যৌক্তিকতা দেখান আছে, তাহার পর অন্যান্য দেশী-বিদেশী তাবৎ বীমা কোম্পানির প্রবঞ্চনা এবং অন্তঃসার-শূন্যতার প্রমাণ উপস্থিত করা আছে ; তাহার পর যদি মন ভেজে।

অবশ্য দেশী এবং বিদেশী কোম্পানিগুলো যে প্রবঞ্চক এবং অন্তঃসারশূন্য এটা বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না। যতদূর খবর পাওয়া গেছে এবং পরিচয়েও যেটুকু বোঝা গেছে এ-সম্বন্ধে ড্যাট্‌ সাহেবের তাহার সঙ্গে মতান্তর নাই। কিন্তু ও-সবের মধ্যে প্রুডেনশ্যাল ফ্যামেলি যে একমাত্র ব্যতিক্রম, এ ধারণাটা অমন সুরক্ষিত মনোদুর্গে কোনও ফাটল-টাটল দিয়া সঁাদ করাইয়া দেওয়া চলিবে কিনা, সেই হইয়াছে সমস্যা।

কোন আশা নাই ; বড় বড় জাঁদরেল রকম এজেন্টরা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানে কি এই আই-এ ফেল কোঁচা-লটকান ছোকরা-এজেন্ট অনাথ সরকারের কাজ ?

তবে লোভ ছাড়া দুষ্কর। লোকটা শ্বশুরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে অগাধ টাকা ঘরে তুলিয়াছে। আর ইনশিওরেন্সের ভাষায় যাকে বলে একেবারে 'ভার্জিন সয়েল'—না রেস্, না শেয়ার-মার্কেট, না ইনশিওরেন্স—কোনটাই ফালের একটু আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারে নাই।

তাই এই কঠোর তপস্যা চলিতেছে ; ধ্রুব কিংবা প্রহ্লাদের তপস্যার চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়।...তবে কোন আশা নাই।

আর আজকের ব্যাপারে উৎসাহও ভাঙিয়া গেছে। অন্তরালে রাজা-বাদশাকেও সবার 'সম্বন্ধী' হইতে হয়। এ একেবারে গালা-গালটা স্বকর্ণে শুনিতে হইল ! এর পরে আর এ-বাড়িতে পা দেওয়া চলে না।

মনটা সত্যই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আত্মধিক্কারে। সমস্ত দিন নানান জায়গায় হাজির দিয়া দিয়া পায়ের সূতা ছিঁড়িয়া যাইতেছে ; আসল কাজের জমার ঘরে একেবারে শূন্য। চাকরির সমস্ত দ্বার বন্ধ, ওদিকে বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ভরসা এই দালালিটুকু, এইটুকুকে সারাদিন নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া যদি দু'ফোঁটা রস গড়াইয়া আসে হাতে।....চোখে জল আসিয়া পড়ে। অবশেষে গালাগালটা পর্যন্ত অদৃষ্টে ছিল !

গলাটা শুকাইয়া আসিতেছে—গলার রসই যেন চোখে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা—তিনটি ঘণ্টা আজ একাসনে গিয়াছে ! অনাথ সরকার গিয়া একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইল। বলিল, "দু'পয়সার দু'টি ডবল খিলি বেশ ভাল করে সেজে দে দিকিন।"

পানওয়ালার অবস্থা ভাল, দুইটি সহকারী। নিজে অন্য একটি ছোকরার সহিত কি লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছিল, হুকুম করিল, "খুব ঠিকসে বনা দে বাবুকো।"

তাহার পর হাসিয়া অনাথ সরকারের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু, একে জিজ্ঞেস করেন তো আমার কে হোয়।" অনাথ বোধ হয় প্রশ্নেরই উদ্দেশ্যে ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

ছেলেটি একটু লজ্জিতভাবে ছদ্ম-ক্রোধের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ও পাগলা আছে বাবু, শুনবেন না ওর কথা।"

"আচ্ছা, শপথ করকে বোলো।"

যে ছোকরা পান সাজিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "ওর বহিনকে সোমবারী রাউত সাদী করেছে বাবু।"

ছেলেটা তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "হামারা বহিন হি নেহি হ্যায়, হোগাভি নেহি, বাপ-মা দুনো চৌপট!" বলিয়া ওদিক দিয়া নিজের নিশ্চিন্ততায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর অনাথকে সাক্ষী মানিয়া বলিল, "আপনিই বিচার করেন বাবু, গাঁয়ের লেড়কী সাদী করলেই যদি সব হোত তো সোমবারী ভইয়ার গাঁয়ে যারা সাদী করেছে সবাই তো সম্বন্ধে ওর...."

সোমবারী হাসিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল এবং উহারই মধ্যে খানিকটা বলপ্রয়োগ করিয়া বলিল, "মানো গে কি নেহি?"

ছেলেটা বেকায়দায় পড়িয়া একটু ছটফট করিল, ছাড়াইতে না পারিয়া আবদ্ধ স্বরে কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, মান লিয়া।"

সোমবারী ও তাহার দুই সহকারী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছেলেটা একটু অপ্রতিভভাবে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, তবে খাতির করো..."

সোমবারী কৃত্রিম আগ্রহের সহিত বলিল, "হাঁ হাঁ জরুর... খাতির করব না বাবু? বোড়ো কুটুম আছে!"

ছেলেটা ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "লে আও এক প্যাকেট গোল্ড ফেলেক...ঠিক কি না বাবু? বড় কুটুমের বড় খাতির হোবে না?"

সোমবারী নিজের পরাজয়ে হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু অনাথ দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, আলবৎ, আরে সোমবারী রাউত ফকির নেহি হ্যায়, তুম মান তো লিয়া আখির? (তুই শেষ পর্যন্ত মেনে ত নিলি)?"

একটা গোল্ড ফ্লেক্ সিগারেটের বাক্স বাড়াইয়া ধরিল। "বড় কুটুম" সেটা বাঁ হাতে লইয়া ফরমাশ করিল, "দো খিল্লি বনারসী পান—বাদলরামকা জরদা ডাল দেনা,—এক বোতল আইস্-নিম্লেট্ —বড়া বোতল..."

ছেলেটার পান সাজা হইয়াছিল, অনাথের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "লেন বাবু।"

অনাথ সোমবারী রাউতের শখের বড় কুটুমের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, শুনিতে পাইল না। ছেলেটা আবার বলিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হো গিয়া?"

তাহার পর খিলি দুইটা লইয়া দাম চুকাইয়া আবার কি চিন্তা করিতে করিতে মন্থর গতিতে বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার পরদিন অনাথ আবার ড্যাট্ সাহেবের বাড়ি হাজির হইল। মালী মরশুমী ফুলের গাছ নিড়াইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল,—"সাহেব তো কোর্টে গেছেন।"

সেটা জানিয়াই আসা, তবুও অনাথ একটু নৈরাশ্যের ভান করিয়া

বলিল, "সত্যি! তবে তো কাজ হল না।...আচ্ছা মেম সাহেব আছেন?"

জানা গেল তিনি আছেন। তাহার পর বাগানের প্রশংসা করিতেই আরও জানা গেল একটু আরাম করিয়া শীঘ্রই নামিবেন। বাগানের ভারি শখ, সমস্ত দুপুরটা তাঁহার এইখানেই কাটে।

অনাথ বলিল, "হ্যাঁ, শুনেছি বটে, বাগান আর কুকুরের বড় শখ, সমস্ত দুপুর লীয়নটাকে সঙ্গে করে বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান।"

টের পাওয়া গেল, না, কুকুরের শখ তো দূরের কথা, একেবারে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, আর সাহেবের অবর্তমানে লীয়নকে কি খুলিবার যো আছে? তাহা হইলে তো একটা মহামারী কাণ্ড হইয়া পড়িবে। লীয়ন বাড়ির পেছনে কেনেলে বাঁধা আছে।

তাহা হইলে লীয়নকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিয়োজিত করা হয় নাই। অনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া বারান্দায় গিয়া বসিল। ছোট বারান্দার মাঝখানে একটি গোল টেবিলের চারিধারে কৌচ। সিঁড়ি, বারান্দার কিনারা নানারকম গাছের টবে ভর্তি। উপর হইতে তারের ছোট ছোট ঝুড়িতে কয়েক রকম অর্কিড টাঙান। বারান্দাটি দক্ষিণ-মুখো, একদিক দিয়া গাছের জাফরি ভেদ করিয়া নূতন শীতের সূর্যের কয়েকটি রশ্মি আসিয়া শরীরের খানিকটা উত্তপ্ত করিতেছে। লাগিতেছে বেশ মিষ্ট।

অনাথ দাঁতে আঙ্গুল খুঁটিতে খুঁটিতে চিন্তা করিতেছিল। আজ একটা নূতন পথে পা বাড়াইতে হইবে। সাফল্যের সংশয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপানিটা এক একবার বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তবুও একবার চেষ্টা করিতে হইবে। একটু সাহস। সে সাহসে কি আনিয়া দেয় বলা শক্ত। যদি আনেই অবজ্ঞা, যদি আনেই অপমান তো তাহাই অদৃষ্টের দান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনটা তো এই পদে পদে অদৃষ্টকে যাচাই করিয়া চলে,—দেখা যাক, তাহার অদৃশ্য করে বরাভয়, কি অভিশাপ···

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় হালকা চপ্পলের ঘা পড়িল যেন। অনাথ

উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, বুকের স্পন্দন অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল।··· শব্দটি দ্বিতীয় ধাপে নামিল, অলস, মন্থর পাদুকার আর একটি কোমল আঘাত নয়, স্পর্শ-ই বলা ঠিক। তাহার পর পদক্ষেপ একটু দ্রুত হইয়া উঠিল। অনাথ কৌচটা ঠেলিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির বাঁকে একটি নারীমূর্তির আবির্ভাব হইল।

"কি দরকার আপনার ?...মিস্টার দত্ত তো এখন···

অনাথের অবস্থাটি বর্ণনাতীত। একটু দুর্বলতা, এক লহমার একটু দ্বিধা। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কাটাইয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া গেল এবং মুখটা যতটা সম্ভব সিধা করিয়া তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, দত্তজা মশাইয়ের সঙ্গে আমার দরকার নেই তো, আমি এসেছিলাম···"

বরাভয় কি অভিশাপ বোঝা যায় না। চোখে শুধু একটা উগ্র বিস্ময় লাগিয়া আছে।

"কিছু চাই কি আপনার ? চাঁদা টাঁদা···

"আজ্ঞে না, আপনার কাছে অত হালকা প্রার্থনা নিয়ে আসব কেন ?"

সেই রকমের স্ত্রীলোক, যাঁদের এ ধরণের কথা অনায়াসেই বলা চলে। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, সমস্ত অবয়বে একটি শান্তশ্রী, একটি প্রসন্নতা পরিব্যাপ্ত। মুখে এখন কৌতূহলের সঙ্গে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেটি অন্তরের সহজ আনন্দ-রূপটি ঢাকিতে পারে নাই। অনাথের চোখে এটা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না, কেন না এ ব্যবসায়ে নবাগত হইলেও দৃষ্টিতে কোথায় অনুরাগ, কোথায় বিরাগ লুকান আছে, সেটা আবিষ্কার করিয়া ফেলায় সে দক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

মহিলাটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর হইবে, অর্থাৎ সেই বয়স যেই সময় সংসারের খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করায় স্বভাবের মধ্যে বেশ একটু গাম্ভীর্য আসিয়া পড়ে, অথচ এমন একটা পরিপক্কতা আসিয়া পড়ে না, যাহাতে কেহ দুইটা মিষ্ট কথা বলিলে, কি একটু তোষামোদ করিলেই কূট উদ্দেশ্যের সংশয়ে সতর্ক হইয়া পড়ে।

ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"গুরুতর প্রার্থনা পূরণ করবার আমার সাধ্যি কী আছে ? তবু বলুন, শোনবারও তো একটা কৌতূহল হয়।"

সবচেয়ে তফাতের কৌচটিতে বসিলেন।

অনাথও একটু হাসিল, বলিল,—"আমি যা প্রার্থনা করতে এসেছি তা আগেই অপর হাত থেকে পেয়ে গেছি অযাচিত ভাবে। কিন্তু সে-পাওয়ার মধ্যে একটু খুঁত থেকে গেছে। দানপত্র হাতে এসেছে দাতার স্বাক্ষর সমেত, কিন্তু তাঁর একলার স্বাক্ষরে দাবী-দাওয়া সাব্যস্ত হবে না, আপনারও দস্তখত চাই ; তাই আপনার কাছে আসা।"

রমণী কতকটা বিমূঢ়ভাবে রহিলেন। একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"বুঝতে পারছি না আপনার কথা ঠিকমত, কে দানপত্র দিয়েছে ? দানপত্র...আপনি একটু স্পষ্ট করে বলুন।"

অনাথ মনে মনে বক্তব্যটা যেন একটু গুছাইয়া লইল, তাহার পর বলিতে লাগিল,—"আমি হচ্ছি প্রুডেনশ্যাল ফ্যামিলী ইনশিওরেন্সের এজেণ্ট।...চোদ্দ বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি, এখন সতরো। বুঝতে পারছেন, অদৃষ্টের বিশেষ তাগাদা না থাকলে সতরোটা ক্যানভাসিং করবার বয়স নয়। তবুও বছর দেড়েক কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম তাগাদা। আই-এ টা আরম্ভ করলাম, গেলামও এগিয়ে অনেকটা, কিন্তু ঠিক যে সময় পরীক্ষা দেওয়ার যোগাড়যন্ত্র করছি, সেই সময় তাগাদা এত জরুরী হয়ে উঠল যে, আর ঠেকান গেল না। চাকরির বাজার ঘুরলাম, জোড়া ত্ব'এক জুতো নিঃশেষের পর আর উৎসাহ রইল না ; আগে গেলেই ভাল হত, কিন্তু লোকসানের কপাল কি না, মাস চারেক চোরা উৎসাহটা রইল সঙ্গে। তারপর এই অধম-তারণ ইনশিওরেন্স।

"ওদিককার ইতিহাস এই। আপাতত এই অবলম্বন করে মাস তিনেক এই শহরে কাটল। দেখছি আরও দুর্গম পথ। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এত কোম্পানি গড়ে উঠেছে, আর তাদের চরেরা গেরস্তদের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত এমন ভর্তি করে ফেলেছে যে,

লোকেরা কি করে সে কল্যাণ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কোন রকমে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে সেই ভেবে ক্ষেপে উঠেছে।…আপনি হাসছেন? কিন্তু ব্যাপারটা এই-ই, একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বুঝিও সব, কিন্তু পেট বোঝে না একটুও।…অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে না—সেখানে গীতার বাণী সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"মা ফলেষু কদাচন….

"কাহিনীটা বেড়ে যাচ্ছে, আপনি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন?

"…হচ্ছেন না? সে আপনার দয়া!…যা হোক, যে ফল আকাঙ্ক্ষা করে এত কাণ্ড, তা না পেলেও ভগবান আমায় অন্য দিক দিয়ে এক অপূর্ব পুরস্কার দিয়েছেন। সেই সম্পর্কেই আমার আসা।

"আমি এ বাড়িতেও বার-চারেক এসেছি, বোধ হয় আপনার নজরেও পড়ে থাকব। ফলে দত্ত সাহেবকে এতটা সন্তুষ্ট করে ফেলেছি যে কাল ঘরের ভেতর পর্দার আড়াল থেকে শুনলাম, তিনি নিজের মুখে আমার সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম সম্বন্ধ পাতিয়ে প্রীতি-সম্ভাষণ করে ফেললেন।"

রমণী কৌতূহলে, বিস্ময়ে, আশঙ্কায় মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনাথ একরকম করুণ অথচ হালকা রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'সে সম্বন্ধী আজও খোঁজ করতে এসেছিল না কি?'—ঠিক সম্বন্ধী বলেন নি, কথাটার মানে হয় সম্বন্ধী…"

রমণী ঘৃণায় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছি ছি, এই কথা বললেন উনি আপনাকে! কি করে পারলেন বলতে!… আমি ওঁর হয়ে…"

অনাথ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এতে ছি-ছি'রই বা কি আছে বলুন না।"

"সে কি! উনি এমন একটা গালাগাল দিলেন, আর….

"দেখুন, আমায় কথাটা প্রথমে ঐ ভাবেই আঘাত করেছিল বটে, কিন্তু পরে একটু অদ্ভুত ভাবেই এর আর একটা দিকে আমার নজর পড়ে। সেটা…থাক, সে আর আপনাকে বলব না…

"মোটকথা আমি আমার পারিবারিক সম্বন্ধের রাজপথ আর অলিগলি সর্বত্র মনে মনে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কোনখানেই একটিও ভগ্নীর সন্ধান পেলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হলাম, যাক্, ভগবান আমায় বঞ্চিত করে গালাগাল থেকে বাঁচিয়েছেন।"

অনাথ হাসিয়া একটু থামিল। তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তাহাতেই আবার সচকিত হইয়া সে একটু ম্রিয়মাণ হইয়া বলিল, "কিন্তু মনের গতি বড় কুটিল তা জানেনই, যে অভাব আমায় নিশ্চিন্ত করলে সেই অভাবই একটু পরে আমার মনটা বড় বিষণ্ণ করে তুলল, অর্থাৎ যে-বোন থাকলে আজ পরোক্ষভাবে অপমানিত হত তার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমরা চারটি ভাই, একটি বোনের অভাব সকলেই বড় অনুভব করি। বাবা মা বলেন ভগবানের দয়া, না হ'লে এর উপর আবার তার বিয়ের দুর্ভাবনা ছিল, কিন্তু এ দয়ার বেদনা যে তাঁদের কত গভীর তা আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না। যদি বলি কাল সমস্ত রাত এই না-থাকা বোনের চিন্তায় কেটেছে আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন না।"

মিসেস দত্ত হঠাৎ বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, অনাথ চুপ করিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "করব বিশ্বাস। দেখুন আমারও ভাই নেই...আর সব চেয়ে কষ্ট হয়, লোকে যখন কানাঘুষা করে, ভাই থাকলে আর বাপের এতবড় সম্পত্তিটা আমি পেতাম না......মানুষ মানুষের বেদনা কত কম বোঝে দেখুন।"

অশ্রু ঠেলিয়া আসিবার ভয়ে মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, তাহার পর হঠাৎ যেন মন হইতে এই আতুর ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনাথ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু বিধাতার বঞ্চনা নিয়ে দুঃখ করেই বা কি হবে? আমার মাথায় একটা মতলব এল, দুষ্টুবুদ্ধিও বলতে পারেন, ভাবলাম, চাই কি, এ থেকে একটা মহালাভও হয়ে যেতে পারে।"

মিসেস দত্ত একটু বিস্মিত হইয়া অনাথের মুখের দিকে চাহিলেন,

তাহার পর একটি ক্ষীণ স্মিত হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"লাভ! —গালাগাল থেকে কি লাভ হবে?"

"দিদি লাভ।"

মিসেস দত্ত আরও একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ আঁচলটা মুখে দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কৌতুকদীপ্ত চক্ষে অনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন,— "কিন্তু তাতে যে গালাগালটা আরও পাকা করে নেওয়া হল!"

অনাথ হাসিয়া বলিল, "আপনি ভুল বলছেন দিদি, গালাগালটি যে আর একেবারে রইলই না। মা কখন কখন আমায় বাদশার-জামাই বলে গালাগাল দেন, কিন্তু সত্যিই যদি বাদশার মেয়ে ঘরে আনতে পারা যেত…"

মিসেস দত্ত আবার হাসিয়া বলিলেন, "আপনিও ভুল করছেন, ও গালাগালটা দেন আসলে আমার ভাজকে…কিন্তু আপনি বসুন, তখন থেকে দাঁড়িয়েই রয়েছেন যে…"

অনাথ বসিতে বসিতে বলিল, "আমি এই আদেশটুকুর জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করছিলাম, কেন না এর মানে হয়—দিদি আমায় ভাই বলে তুলে নিলেন। ..আমায় কিন্তু 'আপনি' ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।"

দিন কয়েক পরের কথা। তিথিটা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

এর মধ্যে অনাথ কয়েকবার আসিয়াছে এবং অকৃত্রিম প্রীতি আর শ্রদ্ধার বিনিময়ে একটি স্নেহাতুর চিত্তের নিবিড়তর পরিচয় লইয়া গিয়াছে। অনাথ বলে,—"দিদি, শাপে-বর সত্যিই হয়। জামাই-বাবুকে ধন্যবাদ না দিতে পারা পর্যন্ত মনটা হাল্কা হবে না।"

অবশ্য, জামাইবাবুর সঙ্গে এখনও দেখা হয় নাই। কারণ অনাথ আসে দুপুরটিতে, তাঁহার অবর্তমানে—ইচ্ছা করিয়াই।

ভাই-বোনের মধ্যে স্থির হইয়াছে, দেখাটা করিতে হইবে একেবারে অকস্মাৎ, আর নিতান্তই এক অপ্রত্যাশিত, অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে।...হাওয়া যদি অনুকূল বোধ হয় তো অনাথ আর একবার অদৃষ্ট পরীক্ষাও করিবে বলিয়া মনে মনে আঁচিয়া আছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ড্যাট্ সাহেব আশ্চর্য হইতেছেন—বাড়িতে আজ যেন কিছু বাড়তি আয়োজন হইতেছে। এই দিনটির সম্বন্ধে সাধারণত মিসেস ড্যাটের একটি নিগূঢ় বেদনা আছে। এবার ভাবটা বেশ প্রসন্ন, রহস্য-মুখর। ড্যাট্ সাহেব তাই আশ্চর্য হইয়াছেন; দু'একবার প্রশ্ন করিয়া কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

দুইজনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি সতরো-আঠার বৎসরের প্রিয়দর্শন যুবক ফটক খুলিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল; একটু অনিশ্চিত চিত্তে থমকাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দৃষ্টি নত করিয়া অবিচলিত পদে বাগান পার হইয়া, বারান্দায় উঠিয়া ড্যাট্ সাহেব এবং পরে মিসেস ড্যাটের পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মিসেস ড্যাট্ মাথায় হাত দিয়া আশিস-অভ্যর্থনা করিলেন,—"এস ভাই, দীর্ঘজীবী হও।"

তাহার পর মিস্টার ড্যাটের বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখিয়া হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ড্যাট্ সাহেব ছেলেটিকে দেখিয়াছেন কবার এর আগে—খুব স্নেহের চোখেও নয়। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ভাই! এ ছোকরা...মানে, ইনি ভাই হলেন কবে তোমার?···কই, তোমার যে ভাই আছে···কি রকম ভাই হন ইনি? কই আমি তো আজ পর্যন্ত কিছু জানি না···বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

মিসেস দত্তের চাপা হাসিতে মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিতে পারিলেন না; আঁচলে মুখ চাপিয়া, কষ্টে হাসি রোধ করিয়া বলিলেন,—"না, কিছু জানতে না!—না জানতে তো সেদিন ঠাট্টা করে ওকে—মানে অনাথকে, ওই কথা বলে ডাকলে কি করে?" আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"কি কথা!"

"কেন?—'সম্বন্ধী'—যে কথাটার মানে হয় সম্বন্ধী।"

ড্যাট্ সাহেব প্রথমটা আরও বিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহার পর স্ত্রীর হাসিতে, অনাথের সলজ্জ এবং বোধ হয় একটু চটুল হাসির ভাবে তাঁহার কাছে ব্যাপারটা যেন কিছু কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল।

"ও!—বোধ হয় বুঝেছি"—বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন। অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"দিদির ভাই-ফোঁটা নেওয়ার আগে আমার একটা কাজ সেরে নিতে হবে জামাইবাবু;—আগে সেবা তারপরে আশীর্বাদ কি না—দীর্ঘজীবন পাকা করে আপনাদের দু'জনের অমূল্য জীবন দু'টি বীমা করে রাখতে চাই···আশ্চর্য হবার কিছু নেই এতে...আর, হলামই বা ছোট ভাই—দিদির বাপের বাড়ির দিক থেকে আমিই এখন একমাত্র অভিভাবক—সে হিসেবে দিদির আর সেই সঙ্গে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার একটা কঠিন দায়িত্ব আছে তো?···"

শশুরে

হরিবিলাস সর্দার বিবাহসংক্রান্ত বিলটা কতদিন হইল পাস হইয়াছে বলুন তো ?...আপনি যে আঙ্গুল গুণিতে বসিয়া গেলেন ! না, অত মাস তারিখ ধরিয়া হিসাবে দরকার নাই। মোটামুটি ছয় সাত বছর হইল, না ?

তাহা হইলে আমার নায়িকা সোনিয়ার বয়স হইল আঠারর কিছু বেশি, আর নায়ক মিঠুয়ার বয়স সম্ভবত পনরো, দু'এক মাস কমই হইবে, বেশি তো নয়ই।

সোনিয়ার বাপের বাড়ি বিহারের একটি শহরের উপান্তে ; শহরের ক্ষীণ আলো আর পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আর কি। বাপ প্রথমটা সর্দা অ্যাক্টের গোলযোগটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, শহরে ওরকম কত ঢেউ উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। যখন ঢেউটা মিলাইয়া না গিয়া সত্যই দেশটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। ছেলের বাজার তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে, পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া প্রায় ক্রোশ ছয়েক দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে মিঠুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তাহার উচ্চতা সওয়া গজ আন্দাজ, সোনিয়ার চেয়ে ঠিক এক মুঠার উপর দুই আঙ্গুল বড় ! বিবাহ হইয়া গেল।

মধ্যের এই ছয় সাত বৎসরের ইতিহাস বাদই দেওয়া যাক। কোনও রোমান্সের খোরাক নাই, নায়ক-নায়িকার মধ্যে কুল্যে দেখা-সাক্ষাতের যো নাই তো রোমান্স ! আপনাদের অত সহজে থামান যাইবে না, জানি। জিজ্ঞাসা করিবেন অন্তরালের, অদর্শনের রোমান্স ?...মিঠুয়ার তরফে যে কিছুই নাই, এ কথা বেশ নিঃসংশয়ে

বলা চলে। ছেলেটা হাঁদা গোছের, খানিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। নিয়মিতভাবে খাওয়া-দাওয়া, গরু-মহিষ চরান আর ক্ষেতে ফসল তোলার বাহিরেও যে একটা দুনিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার অত খোঁজ-খবর নাই। তাহার 'মনোভাব' নামক জিনিসটাই গজায় নাই, সে ক্ষেত্রে সোনিয়া সম্বন্ধে তাহার মনোভাবটা কি সে কথাই ওঠে না। এক কথায় বলা চলে ছোঁড়াটা 'মাথায় বাড়িয়াছে,' কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।

অবশ্য সোনিয়ার কথা একটু ভিন্ন। একে মেয়ে, তায় যত অল্পই হোক না, শহরের একটু গন্ধ আছে। তাহা ছাড়া বয়সেও তো সে মিঠুয়ার চেয়ে বড়। এর উপর যখন ধরা যায় তাহার স্বভাবটাও স্বামীর মত হাঁদাটে নয়, তখন তাহার মনের জটিলতা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। ঘরকন্নার কাজের অতিরিক্তও তাহার কাজ আছে। কাপড়টি ছোবান, সাজিমাটি দিয়া ঘাটে বসিয়া চুলের গোছা ধোওয়া, শহরে মার সঙ্গে কিছু বেচাকেনা করিতে গেলে শহরের হাওয়া একটু লক্ষ্য করা, বাঙালীদের 'বেটি-বহু'রা কিভাবে কপালে টিপটি পরে, এদেশীরা হাতে কি ধরনের মেহদির নক্সা তোলে, মণিবন্ধে, বাজুতে, কণ্ঠের নিচে কি ধরনের উল্কি আজকাল চলতি—এই সব।

সুবিধা পাইলে—ধরুন, মা যখন কাহারও বাড়িতে ধানটা ঝাড়িয়া দিতেছে, কিংবা দালটা বাছিয়া দিতেছে—সে সমবয়সীদের দলে ভিড়িয়াও যায়—অবশ্য তাহার অবস্থার মেয়ের পক্ষে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে ভিড়া সম্ভব। মোট কথা, মিঠুয়া বোধ হয় যে সময়টা মহিষের পিঠে শুইয়া মাঠের মাঝে অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, কিংবা ঘুড়ি-নাটায়ের ঝগড়ায় মার খাইয়া কান্নার চোটে পাড়া মাথায় করিতেছে, তাহার পত্নী সোনিয়া তখন সমবয়সীদের কাছে এমন সব সংবাদ শুনিতেছে, যাহাতে তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

অবস্থা যখন এবম্প্রকার, মিঠুয়ার বাপ বুধন মড়র একদিন হঠাৎ আসিয়া বেহাই-বাড়িতে উপস্থিত হইল। রৌদি মহতো নেশা-

পানি আনিয়া বেহাইকে অভ্যর্থনা করিল। বুধনের মেজাজটা একটু যেন বেশি রকম রুক্ষ, বলিল, "এ তো ভাল কথা নয় সম্‌ধি (বেহাই), টাকা নেই টাকা নেই বলে মেয়ের দ্বিরাগমন করাচ্ছ না, ওদিকে আমার যে মুখ দেখান ভার। বেটীর চালচলন শহুরে হয়ে উঠছে—সে দেশ পর্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল, অথচ তোমার যেন হুঁশই নেই। কবে তোমার টাকা হবে, মেয়েকে কায়দা-মাফিক বিদায় করবে, সে ভরসায় থাকলে তো চলবে না। আমি আজ এসেছিলাম শহরের দিকে, ফিরে গিয়ে জ্যোৎখীজীর (জ্যোতিষীজীর) কাছ থেকে দিন দেখিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেয়ে পাঠাবার যোগাড় কর।"

বেহাই বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিল। ক্ষেতে মকাইটা হইয়াছে ভাল এবার, ফসলটা উঠিলেই মেয়েকে বিদায় করিবে। হাত এখন নিতান্তই খালি, পাওনাদারকে কয়েকমাস সুদ পর্যন্ত দিতে পারে নাই..."এখন পাঠালে কিছুই করতে পারব না, সব সাধ-আহ্লাদই বাকি থেকে যাবে—নাও সম্‌ধি, তুমি আজ যে মোটেই গেলাস তুলছ না..."

ছেলের বাপ রাজী হইল না,—ছেলের বাপই তো? অষ্টম বার গেলাসটা ভরিয়া বলিল—"মনে সুখই নেই তো গেলাস ভরা! তুমি মেয়েকে এক বস্ত্রে, খালি হাতে পাঠিয়ে দাও; আমার জোটে দেব পরতে, না জোটে ন্যাকড়া পরবে। আমি ইজ্জৎদার লোক, আমার ইজ্জৎ বজায় থাকলেই হল।—তবে আসল কথাটা বলতেই হল সম্‌ধি, আজ শহর থেকে আসার পথে কনিয়াকে (বধূকে) সখীদের সঙ্গে যে-রকম বেহায়াপনা করতে করতে আসতে দেখলাম, তাতে—।"

পেটে অনেকখানি গিয়াছে, রাগিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বৌদিও যোগদান করিল। খানিকটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিল— "কে কার বেটি, কে কার বাপ? সব রামজীর লীলা। তুমি নিয়ে যাও তোমার কনিয়াকে সম্‌ধি।"

বুধন গেলাসটা শেষ করিয়া শান্তভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল,

তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল,—"না হয় থাকই তবে মকাই পাকা পর্যন্ত। তুমি ইজ্জৎদার লোক, তোমার কথাটা ঠেলব?—আমার মন যেন সায় দিচ্ছে না।"

রৌদি তখন পাঠাইবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে, প্রবল বেগে হাত নাড়িয়া বলিল,—"না, না; সব মায়ার বন্ধন সম্‌ধি, যত শীগ্‌গির কাটান যায় ততই মঙ্গল; বলে—

কহত কবীর শুনো রঘুনাথা
মায়াধার নরক পথ যাতা

—মায়ার নদী নরকেই নিয়ে যায়। নদীতে গা ভাসাতে চাই না।"

বুধন দুই হাঁটুর উপর হাতের কনুই দুইটা ন্যস্ত করিয়া বলিল, ঠিক বলেছ সম্‌ধি—

আরে কৌন কিস্‌কা বেটা ভইয়া, কৌন কিস্‌কা বাপ।
মায়াকা হও মুটঠি বান্‌হে, হাত পসারো—সাফ্‌।

—কেই বা কার? মায়ার বশে হাত মুঠো করে ভাবছি—কি রত্নই না রয়েছে, খুলে দেখ—ফাঁকি!—কাটিয়াতে আর আছে না কি? দেখ তো।—না থাকে দরকার নেই—এও একটা মায়াই বলতে হবে কি না, যত এড়ান যায় ততই ভাল।"

রৌদির বাড়িতে এই দার্শনিক বৈঠকের দুইদিন পরে মিঠ্‌য়া বধূকে লইতে আসিল। মাথায় একটা গোলাপী চীনে সিল্কের টুপি; গায়ে সবুজ গেঞ্জির উপর একটা পাতলা পিরান, কোমরে হলুদ-ছোবান কাপড়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় জবজবে করিয়া মাখা সরিষার তেল টুপির নিচের অংশটা ভিজাইয়া কয়েকটি ধারায় কপাল, গাল, ঘাড় বাহিয়া নিচে নামিয়া আসিয়াছে—চোখে কাজল।

পথে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়াছিল, শ্বশুরবাড়ির নিকট আসিয়া একটা কানে গুঁজিয়া দিয়া যথাসম্ভব শহুরে হইয়া লইল।

শ্বশুর-শাশুড়ী বাড়ি ছিল না। সোনিয়াকে তাহার দুই তিনজন সখী জোর করিয়া আনিয়া ঘরের ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে দাঁড় করাইল—অবশ্য খুব যে জোর করিতে হইল, এমন নয়। বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া, নাক সিঁটকাইয়া সোনিয়া চাপা গলায় বলিল, "ইস্! কি ভারী মদ্দ রে আমার!—আমি সোজা লোক? নিজে দেড় হাতের হলেও চার হাতের লাঠিই আমার!"

সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল।

একজন সখী বলিল, "তুই তো ঐ বিড়ির মতই ওকে তোর কানে গুঁজে রাখবি সোনিয়া।"

অপর একজন বলিল, "দেখিস, যেন বিড়ির মত ফুঁকে দিসনি তা' বলে।"

আর একটা হাসির লহর উঠিল।

সব না বুঝিলেও, বেড়ার আড়ালে যে একটা কিছু হইতেছে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, মিঠুয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। নিজের পুরুষত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা গলা খাঁখারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহাতে আরও একটা কি মন্তব্যের সঙ্গে বেড়ার ও-ধারে প্রবলতর হাসির বেগ ওঠায় অসহায় ভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

একটু যেন ভিতর হইতে ধাক্কা খাইয়া একটি মেয়ে একেবারে সামনে আসিয়া পড়িল। একটু থতমত খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রশ্ন করিল, "পহুনা (কুটুম) বেশ ভাল আছ তো?"

মিঠুয়া মাথা নিচু করিয়া বলিল, "হুঁ।"

"বলদ মহিষ সব কেমন আছে?" নিজেও হাসিয়া উঠিল, পাশেও দুই তিনটি কণ্ঠে হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মিঠুয়া আরও ঘাড় গুঁজিয়া নিরুত্তর রহিল।

আর একটি মেয়ে দুইবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহিরে আসিল। অযথা এক ঝলক হাসিয়া আবার কৃত্রিম গম্ভীরতার সহিত বলিল,

"আহা কচি ছেলে, ছ'কোশ পথ হেঁটে এসে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গো! দুধ খেয়ে এসেছিলে পহুনা?"

মিঠুয়া তেলে-ঘামে একেবারে জবড়জঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নিচু করিয়া আড়চোখে দেখিল আর একটি বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, "মুখ তোল তো পহুনা, ক'টি দাঁত হয়েছে দেখি। আহা, সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘাড় তুলতে পারছে না।...আচ্ছা, ভাবনা নেই, যাবার সময় হেঁটে যেতে হবে না,—মিতিনকে (সইকে) বলব কোলে করে নিয়ে..."

এমন সময় অপর একদিকে বৌদির গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে বাড়ি ছিল না, এইমাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মেয়েরা যে যেখানে পারিল ছুট দিল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বৌদির স্ত্রী এবং ভগ্নীও বাড়ি ফিরিল: পাড়ার বর্ষীয়সীদের ডাকিয়া রাত বারোটা পর্যন্ত গান হইল। তাহাকে উপলক্ষ করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছে জানিয়া মিঠুয়া মেয়েগুলোর হাতে খোয়ান আত্মমর্যাদা আবার অনেকটা ফিরিয়া পাইল এবং রাতে দৈনন্দিন নেশা করিয়া শ্বশুর যখন তাহার চিবুক ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া অন্তত আর একটা দিনও থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে পুনর্লব্ধ আত্মমর্যাদার বশে কোন ক্রমেই রাজী হইল না।

পরের দিন বিকালে সাজগোজ করিয়া এবং শ্বশুরের দেওয়া একজোড়া রঙিন কাপড় আর উড়ানিটা কাঁধে ফেলিয়া একটা গোটা পুরুষের তেজে বউকে লইয়া বিদায় হইল।

সোনিয়া যাইবে না বলিয়া বাড়ির মধ্যে খুব একচোট কান্নাকাটি ওজর আপত্তি করিল, চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া আর একচোট ধস্তাধস্তি করিল, তাহার পর ঘোমটার মধ্যে একটানা কান্নার সুর তুলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মা, পিসি, পাড়ার বর্ষীয়সী আর সখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের প্রান্তে 'বড়্হম দেওতা'র (ব্রহ্মদেব) আস্তানা পর্যন্ত সঙ্গে গেল, তাহার পরে একবার গলা-

জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়া, সোনিয়াকে বিদায় দিয়া আস্তানার কদমতলাটিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

পথটা প্রায় পোয়াখানেক পর্যন্ত সোজা গিয়াছে। এটুকু সোনিয়া এমন ধীরে ধীরে চলিল যে, দুই তিনবার মিঠুয়াকে থামিয়া পড়িয়া তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। আপত্তির যে রকম নমুনা দেখিয়াছে, দূরত্ব বাড়াইয়া শেষকালে পলাইয়া যাইতেও পারে—শহুরে মেয়েকে বিশ্বাস নাই। মোড়টা ঘুরিয়া খানিকটা পরে কিন্তু তাহার যেন বোধ হইল, বধূর পদক্ষেপ একটু একটু করিয়া দ্রুত হইয়া উঠিতেছে। নূতন বধূ হইতে একটা ভব্য দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকেও গতিবেগটা বাড়াইয়া দিতে হইল। দেখিল, তাহাতেও নিস্তার নাই। তখন নির্জন রাস্তায় তাহার গাটা যেন ছমছম করিতে লাগিল।—মেয়েটা ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছে, মতলবখানা কি?

হঠাৎ সোনিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। মিঠুয়া অজ্ঞাতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বধূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মীয়া ভিন্ন এত বড় মেয়ের সহিত কখনও কথা কহে নাই, প্রবল অস্বস্তিতে পড়িয়া লাঠির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে ঘোমটার মধ্যে থেকেই ফিসফিস করিয়া প্রথম কথা ফুটিল, "ইস্, দৌড়ন হচ্ছে একেবারে!"

ইহা অতিমাত্রায় অপ্রত্যাশিত! মিঠুয়ার প্রথমটা কথাই যোগাইল না, একটু পরে জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "বাঃ, তুমিই তো জোরে চলতে আরম্ভ করলে, আমি সে রকম ভাবে চললে এগিয়েই যেতে।"

ঘোমটায় একটা ঝাঁকানি হইল, শব্দ বাহির হইল, "গমার কাঁহাকে।" অর্থাৎ গেঁয়ো কোথাকার।

মিঠুয়ার যাহা কিছু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, বধূর এরূপ সম্ভাষণে একেবারেই বিলুপ্ত-প্রায় হইল। একটু পরে বলিল, "বেশ, চল আস্তে আস্তেই।"

খানিকটা গেল। একটু পরে হঠাৎ পিছন ফিরিতে দেখিল—বধূর মাথায় ঘোমটা নাই, কখন খুলিয়া ফেলিয়াছে ; সে সশঙ্কভাবে মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইল। ভাবিতে লাগিল—এ তো ভীষণ ফ্যাসাদে পড়া গেল, মাঝ-রাস্তায় কি করিয়া এই অভাবনীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পিছনে তাহার জামার খুঁটে টান পড়িল। যদিও ফিরিয়া দেখিল, বধূর হাত তাহার অঞ্চলের ভিতরেই অচঞ্চল ভাবে আছে, তবুও তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ ঐ দুঃসাহসিকারই কাজ। প্রশ্ন করিল, "কিছু বলছ ?"

বধূ ঘোমটামুক্ত মুখটা ব্যঙ্গের সহিত ঘুরাইয়া বলিল, "কাকে ?"

"আমায় ?"

সোনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, "ওঃ, ওঁকে বলছে, মস্ত সমঝদার লোক কি না। গেঁয়ো বুঝবে শুধু মোষ-বলদের কথা।"

এ রকম ভাবে ঘা দিলে মিঠুয়ার মত লোকেরও লাগে, রাগে মুখটা ভার করিয়া বলিল, "হ্যাঁঃ, বুঝি কিনা বলেই দেখ না।"

"ঢের বলেছি আর ঢের বুঝেছ ; চল এখন, সামনে লোক আসছে।"

ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যখন আন্দাজ করিল লোকটা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, ঘোমটাটা খুলিয়া একেবারে পাশাপাশি আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। বোধ হয় দুইজনে মতলব করিয়া পথিকটিকে প্রবঞ্চনা করায় দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা আরও নিবিড় হইয়া গেল। অবশ্য সোনিয়াই অগ্রণী, বলিল, "গল্প করতে করতে চল না ; হাবা না বোবা ?"

"কি গল্প বলব ?—রাজারাণীর না হুড়ারের (নেকড়ের) ?"

সোনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "মন্সার (মিনসের) কথা শোন না ? আমি কি খুকী যে বাঘ-ভূতের গল্প শুনব ? তুমিই

বরং দুধের ছেলে...কালকের কথা মনে আছে ?—আমার মিতিন্‌দের হাতে নাকালটা ?"

মিঠুয়া চুপ করিয়া রহিল। সখীদেরই একটা কথা সম্বন্ধে সংকেত করিয়া সোনিয়া বলিল,—"পা ব্যথা করছে না তো ? যদি করে তো বল না হয়..."

শেষ করিতে না পারিয়া মুখে হাত দিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঠুয়া লাঠিটা বাগাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাদের সবগুলোকে আমি কাঁধে করে অমন পাঁচ ক্রোশ ঘুরে আসতে পারি—আমার নাম মিঠ্‌ঠু মড়র, হুঁ !"

"ওঃ, তাই তো গা ! তা, তাদের বললে না কেন ? তাহলে হনুমানজি বলে তোমায় পূজা করত।"

হাসিতে হাসিতে বলিল, "তিনিও রাম-লক্ষ্মণ-সীতাজী—সবাইকে একসঙ্গে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন।.. নাও, খানিকটা এগিয়ে যাও, একটা গ্রাম এসে পড়ল।. এখন হাত ধরে মড়রকে শেখাই দু'বছর।"

নিজেও ঘোমটাটা টানিয়া দিল এবং গতি মন্দ করিয়া স্বামীর আর নিজের মাঝে উপযুক্ত ব্যবধান করিয়া লইল। গ্রামটায় বসতি বিরল, তবে রাস্তার দু'ধারে দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া, কোথাও বা রাস্তার মাঝে আসিয়া—"কনিয়া গে, দুগো ধনিয়া দে"—বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ছড়া কাটিতে লাগিল। একটু যাহারা বোঝে, বর কনের বয়সের তারতম্য লইয়া অম্ল-মধুর মন্তব্য ছাড়িতে লাগিল।

গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা গিয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুরের পাড়। রাস্তার একটু পাশেই একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের তলায় রানাভাঙা একটা পুরাতন ঘাট। লোকজন নাই কেহ। সোনিয়া বলিল, "তেষ্টা পেয়েছে, চল একটু বসি।"

মিঠ্ঠু মড়র বাহাদুরি দেখাইয়া বলিল, "ইঃ দু'ক্রোশ তো পথ, তার মধ্যে আবার চারবার বস! আমার তেষ্টা পায় নি।"

সোনিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তবে তুমি যাও।"

"আর তুমি ?"

"আমি জিরিয়ে টিরিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।"

যা মেয়ে দেখা যাইতেছে, ও তা পারে। মিঠুয়া শুষ্ক মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সোনিয়া ঘাটের রানায় একটা জায়গায় গিয়া বসিলে সেও গিয়া পাশে বসিল। সোনিয়া গা-টা গুটাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ কাণ্ডটা! আর জায়গা নেই না কি যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে ? আচ্ছা পাড়াগেঁয়ে ভূত তো!"

মিঠুয়া অতিমাত্র অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যে-রকম উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মনে করিয়াছিল খুব কাছে বসাটাই বরং অভিজ্ঞ নাগরিকের মত হইবে। বোকার মত একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আর বসবার মত পাকা জায়গা তো দেখছি না: তাহ'লে তো আমায় নিচে বসতে হয়।"

সোনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "তাইতো গা—এত বড় অপমান! আমি···" হঠাৎ থামিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কত বয়স হল ? এগার ?"

মিঠুয়া যথাসম্ভব জোর দিয়া বলিল, "পন্দ্রহ্ !"

সোনিয়া কথাটাতে মিঠুয়ার চেয়েও জোর দিয়া চোখ পাকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি পন্দ্রহ্ বছরের মদ্দ—অমুক মড়র—আমি বসব নিচে!....নিচে বসবে না তো কোথায় বসবে ?—আমার বয়স যে উন্নৈস!—বিশ্বাস হচ্ছে না ?"—বলিয়া তাহার উনিশ বৎসরের সমস্ত শরীরখানি কপট দর্পে বিজলিত করিয়া, রানার নিচে পা দুইটি ঝুলাইয়া, বিপরীত দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া বসিল।

একটু পরে ফিরিয়া দেখিল, পনরো বৎসরের জীবটি নিজের পরাজয় মানিয়া লইয়া, জড়সড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে, ঘাসের উপর বসিয়া আছে। একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল,

"ব'সে না থেকে, দু'টো ভালসারির (বকুলের) ফুল কুড়োও দিকিন। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি।"

"ফুল কি হবে?"

"বাড়ি গিয়ে তোমায় ভেজে খাওয়াব, হাঁদারাম—"

সোনিয়া মুখ ধুইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিয়া উঠিল। ছোবান শাড়ির কোঁচা দিয়া মুখ মুছিয়া মিঠুয়ার দিকে মুখটা হঠাৎ বাড়াইয়া বলিল, "দেখ তো আমার কপালের টিক্‌লিটা (টিপ) ঠিক আছে কি না!"

"এক পাশে সরে গেছে।"

"কোন্ দিকটায়?"

"ডান দিকে।"

সোনিয়া মেহদি-রঙান তিনটি আঙ্গুলের ডগা টিপ ছাড়া কপালের আর সব জায়গাটায় বুলাইয়া বলিল, "কোথায়? বুঝতে পারছি না তো।"

"ডান দিকে ভুরুর ওপরে।"

সোনিয়া আবার সেইরূপভাবে হাত বুলাইয়া বলিল, "কোথায়? দুৎ, মিছে কথা, পড়ে গেছে নিশ্চয়।"

"না, না পড়ে নি।"

সোনিয়া ঝগড়া করার মত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ —পড়েছে, নিশ্চয় পড়েছে,—চাষা!"

মিঠুয়া আশ্চর্য হইয়া গেল;—ঐটুকু ছোট কপালটায় হাত বুলাইয়া টিপটা কোথায় ধরিতে পারিল না, এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তা' ছাড়া ইহাতে রাগ করিবার, ঝগড়া করিবারই বা কি আছে! একটু হতভম্ব হইয়া বলিল, "যদি রাগ না কর তো দেখিয়ে দিই।"

"যদি খালি টিপটা খুঁটে নিয়ে বসিয়ে দিতে পার তো কিছু বলব না, কিন্তু খবরদার যেন…ন্যাকাকে কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

ন্যাকার হাতটা কাঁপিতেই ছিল, তাহার উপর বাঙালী প্যাটার্নের ক্ষুদ্র টিপটা বেশ একটু বাগড়াও দিল ; খুঁটিতে গিয়া কপাল হইতে নাকে পড়িল, সেখান হইতে দুইটি ঠোঁটের মাঝখানে।

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে, যতটা সম্ভব আলগাভাবে সেটাকে উদ্ধার করিয়া কপালে বসাইয়া দিল এবং একটা নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিল।

সোনিয়া দুইটি আঙুল দিয়া টিপটা একটু চাপিয়া দিয়া বলিল, "গেঁয়ো কোথাকার!"

মিঠুয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, "আবার ও কথা বলছ কেন ? দিই নি ঠিক করে খুব সাবধানে ?"

"নিশ্চয় বলব, আমার খুশি ! নাও চল। আকাট গেঁয়ো !".

আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। সোনিয়া কি ভাবিতেছিল, একটু পরে বলিল, "তুমি গেঁয়ো বললে চট ; কিন্তু কাউকে যদি বল যে আমার গায়ে হাত দিয়ে কপালের টিপ পরিয়ে দিয়েছ তো সে আরও গেঁয়ো বলবে। মনে থাকে যেন !"

মিঠুয়া মস্ত বড় বুদ্ধিমানের মত বলিল, "সে আমি বলতে যাব কেন ? এতই বোকা না কি ?"

কথাবার্তা আরও অন্তরঙ্গতার সহিত হইতে লাগিল। পথের মাঝে লোক দেখিয়া যতবারই দুইজনে সরিয়া যাইতে লাগিল, লোক চলিয়া গেলে ততবারই আবার আরও কাছাকাছি হইয়া চলিতে লাগিল। সোনিয়া গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শ্বশুরবাড়ির কথা, ননদ, দেওর, গরু, মহিষ ; নিজে শহরের কথাও বলিতে লাগিল। বাঙালী মেয়েদের কথা। কে এক বাঙালীর মেয়ে তাকে বড্ড ভালবাসিত, সোনিয়া তাহাদের বাড়ি ঘুঁটা যোগাইতে যাইত মাঝে মাঝে—তাহাকে আদর করিয়া বলিত, 'সোনাময়ী'—মানে, সোনার তৈয়ারী। সে না কি সুন্দর বলিয়া তাহাকে এই আখ্যা দিয়াছিল—বাবাঃ, বাবাঃ, বাঙালীর মেয়েরা এত মিথ্যাও জানে ! সোনিয়া না কি আবার সুন্দর !

মিঠুয়ার সাহস বাড়িয়াছে, একটু বোধ হয় জ্ঞানবুদ্ধিও হইয়াছে পথ চলিতে চলিতে। বলিল, "মিছে কথা আর কি বলেছে? তুমি তো সুন্দরই।"

"নিজে যে সুন্দর সে ওরকম বলে—মানে, বাঙালীর বেটী নিজে সুন্দর বলেই আমার প্রশংসা করত।"

মিঠুয়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, এর মধ্যে তাহারও প্রশংসা প্রচ্ছন্ন আছে কি না।

যেন মনে হইল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একটু বলিয়াছে এবং যে ক্রমাগতই এক নাগাড়ে 'গেঁয়ো গেঁয়ো' করিয়া আসিয়াছে, তার মুখে ভালই লাগিল কথাটা।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ঐ ইঁদারাটার পাশ দিয়ে ঘুরলেই আমাদের বাড়ির রাস্তা কি না। আচ্ছা, আসবার সময় তুমি এত কান্নাকাটি করছিলে কেন বলত? এখন তো বেশ…"

সোনিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। খপ্ করিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া চাপা স্বরে উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "সত্যি, এসে পড়েছি না কি! আগে বলতে হয়,—এগিয়ে যাও, এক্ষুণি এগিয়ে যাও—"

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটার ভিতর হইতে কান্নার সুর উঠিল। মিঠুয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া বলিল, "এ কি! এই ত দিব্য ছিলে, বললে, আমাদের বাড়ি খুব ভাল লাগবে, আরও বললে…"

স্বামীকে বেশ একটু ধাক্কা দিয়াই আগাইয়া দিয়া সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "বাড়ি যে এসে পড়েছে। গেঁয়ো ভূচ্চড়কে নিয়ে কী ফ্যাঁসাদেই...."

অতঃপর নিজের গতি মন্দ করিয়া দিয়া বেশ উচ্চ সুরেই বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল।

আচারের অনাচার

বাড়িতে প্রত্যহ চুরি হইতেছে।

চুরির বিশেষত্ব আছে ; সোনা নয়, চাঁদি নয়, কাপড় নয়, বাসন-পত্র নয় ; চুরি হইতেছে আচার আর তেঁতুল।

কিন্তু তাহাও তো চুরি। ধর, যদি ঝিয়ের কাজ হয় তো সেও কি কম ভাবনার কথা ? আজ আচারে হাত পাকাইতেছে, কাল পোক্ত হইয়া পেনিটা, আংটিটা, কানের দুলটা সরাইবে, পরশু দেখিবে গলার হার অদৃশ্য হইয়াছে। গৃহস্থ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া বধূ।

কিন্তু সত্যই কি ঝিয়ের দোষ ? সে বেচারির তো ভয়ে গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে, দেখিলে মনে হয় না মাসখানেকের মধ্যে সে কোন অম্বল জিনিস স্পর্শ করিয়াছে। তবে ননদ—সুধা ?—মেয়েটার বয়স হলেও টক-ঝালের উপর একটু লোভপরায়ণ বটে ; কিন্তু তাহার শপথ খাওয়ার বহর দেখিলে আর মনে হয় না, সে ভিতরে ভিতরে এই কাণ্ড করিতেছে।

দেওর করিবে না,—টক দেখিলেই তাহার গায়ে জ্বর আসে ; চোখ বুজিয়া, নাক কুঁচকাইয়া দশ হাত দূরে পালায়। বৌদিদির ওটা একটা অস্ত্র। যখন দেওর ফাইফরমাশে ডাকে অথচ সে নিজে এড়াইতে চাহে, বলে, "রোসো আসছি, হাতে তেঁতুল-গোলা, ধুয়ে নি আগে হাতটা।"

দেওর উত্তর দেয়, "তুমি তেঁতুলপোকা হয়ে মর, আর আসতে হবে না।"

সে আচারের কাছে ঘেঁষিবে না।

স্বামী হাসিয়া বলে, "টক যদি চুরি যায় তো ধরে নিতে হবে এ

মেয়েদের কাজ। নতুন মা হয়েছে এমন মেয়ে-ছেলে যদি ঘরে থাকে তো চোর ধরবার জন্যে বেশি খোঁজাখুঁজির আর দরকার থাকে না...”

বধূ কৃত্রিম রাগের সহিত বলে, “থাম, নতুন বাপেরা বড় সাধু, একেবারে লোভ নেই!”

স্বামী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া বলে, “আছে; তবে টকে নয়, মিষ্টিতে। মিষ্টি যদি কিছু চুরি যায় তো আমার হাতে হাতকড়ি দিও।”

উভয়েই হাসে।

এসব কিন্তু ঠাট্টার কথা। এর হাসিঠাট্টা থামিয়া গেলে চিন্তা আসে, রাগ হয়। সারা বৎসর ধরিয়া কোথায় দুটো আম-রে, কোথায় কুল-রে, কোথায় তেঁতুল-রে—প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হইয়া সব যোগাড় করা; মসলা ভাজা; দুপুরে ঘুমের কথা ভুলিয়া মাথা-আচার পাহারা দিয়া রৌদ্রে শুকান। এত কষ্ট করিয়া বাঁদর, হনুমান, কাঠবিড়ালির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া জিনিস যদি ঘরে উঠিল তো অমনি অদৃশ্য হইতে লাগিল! শুধু মেহনতেরই কথা নয়। শেষপাতে একটু আচার না হইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর খাওয়া হয় না। চিরকালটা রাজপুতানায় কাটাইয়া ও-অভ্যাসটা জন্মের সাথী হইয়া গিয়াছে। বলেন, “বৌমা, তোমাদের দেশে সে জলও পাব না, সে হাওয়াও পাব না, সে তো আর তোমার হাতে নেই, কি করবে? আমাদের অদেষ্ট: তুমি বাছা আচারটুকু থেকে বঞ্চিত করো না।”

তাই এত ঝক্কি লইয়া করা। কর্তা-গৃহিণী পশ্চিমা চাকর লাট্টুকে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন,—জনকপুর-পশুপতিনাথ সারিয়া কামাখ্যায় যাইবেন; সেখান হইতে জ্বালামুখী। ফিরিতে মাসখানেক লাগিবে। এই কয়দিন হইতে যে রেটে চুরি হইতেছে তাহাতে তাঁহারা ফিরিয়া যে আর আচারের মুখ দেখিতে পাইবেন এমন তো ভরসা হয় না। আর এটা না আমের সময়, না কুলের সময়, না তেঁতুলের সময়। আর সময় হইলেও ও-জিনিস তো একদিনে হইবার নয়।

মহা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর এই এক তীর্থের ঝোঁক হইয়াছে ঠাকুর-ঠাকরুণের! ওঁদের সংসার কে সামলায় এদিকে তাহার ঠিক নাই। সব ছাড়িয়া যদি ছেলেটির আর মেয়েটির কথা ধরা যায় তো তাহাদের সামলাইতেই ঠিক দুইটি লোকের দরকার। ছিলও সে ব্যবস্থা, নাতিটি বেশির ভাগ থাকিত তাহার ঠাকুরমার কাছে, নাতনিটি দখল করিয়াছিল ঠাকুর-দাদাকে—বধূ সারা সংসারটা একাই সামলাইত—একটু গায়ে লাগিত না। এখন পিসিমা আছে অবশ্য—কিন্তু তাহার ভাইপো-ভাইঝিদের দেখা এখন নেহাত শখের দেখা। নূতন বিবাহ—নিজেকে দেখিতেই তাহার বেশি সময় কাটে—তাহা ভিন্ন চিঠি লেখা আছে, সমবয়স্থাদের, সঙ্গ আছে। ভাইপো-ভাইঝিদের নিতান্ত যে না দেখে এমন নয়, তবে কাজে সাহায্য হিসাবে নয়; শখ হইল—যেটাকে হাতের কাছে পাইল লইয়া খানিকটা হুড়াহুড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করিল, কিংবা নিজের বাক্স থেকে ক্রীম, পাউডার, রুজ বাহির করিয়া খুব একচোট সাজাইল; এই।

দেওরের ভালবাসা আবার অন্য রকমের—দাপাদাপি করিয়া চটকাইয়া কাঁদাইয়া সরিয়া পড়িবে। তুমি সামলাইয়া মর।

ইহার উপর কুটুম্বিতা আছে। ননদাইয়ের কলেজ বন্ধ হইয়াছে, সে আজকাল শনিবার-শনিবার আসিতেছে। এই একঘেয়েমির উপর দুইটা দিন কাটে ভাল; কিন্তু তবুও সামলান সোজা নয় তো?

ওঁরা দুজনে দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে তীর্থ করুন।

হাঙ্গামের উপর হাঙ্গাম হইয়াছে দিদি-শাশুড়ীকে লইয়া। শাশুড়ী যাওয়ার ঠিক দুইটি দিন বাদ দিয়া সেই যে বিছানা লইয়াছেন, আজ পর্যন্ত উঠিতে পারিলেন না।

দিদি-শাশুড়ী অর্থাৎ শ্বশুরের শাশুড়ী; সরল কথায় শাশুড়ীর মা। আইনত তিনিই এই বাড়ির মালিক। শ্বশুর যিনি তিনি

আসলে ঘরজামাই। উত্তর জীবনের অধিকাংশ ভাগই রাজপুতানায় কাটানর সঙ্গে এই ব্যাপারটুকুর একটু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহার সহিত এই কাহিনীর কোন সম্বন্ধ না থাকায় সে-সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিবার দরকার নাই।

দিদি-শাশুড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁহার বয়স। সেটা যে ঠিক কত, গ্রামের মধ্যে কাহারও তাহা জানা নেই। ছেলে-বুড়ো সকলে তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছে, ছেলেরা বুড়ো হইয়াও একভাবে দেখিতেছে বলিলেও মারাত্মক রকম অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজে কিছুই বলিতে পারেন না। কুড়ির হিসাবে চার কুড়ি বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া হিসাবের হাঙ্গামা ছাড়িয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"হারানের মা যেবারে সাবিত্রীর বেরতো উজ্জাপন করলে সেইবারে চারকুড়ি পুরো হল। তোর দাদা-শ্বশুর বললে না?—বলে—ঐ বেরতো পার্বণ করেই তো শেষ কর তোমরা আমাদের। নিজের চার কুড়ি হল, আমার হল চার কুড়ি দশ, এখনও যাবার নাম নেই..."

প্রমাণের মধ্যে এইটুকু; কিন্তু হারানের বাপ-মা সাবিত্রী-সত্যবানের দীর্ঘায়ু উপভোগ করিয়া বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করায় হিসাব নিষ্পত্তির আর কোন সুযোগই নাই।

সে-যুগের লোক,—ওরা বাঁচিত বলিয়া হিসাব রাখিত না, আমরা মরি—এবং পদে পদেই মরি বলিয়া হিসাবের গাঁট গুনিয়া গুনিয়া চলি।

এই বুড়ীকে ফেলিয়া যে উহারা তীর্থ করিতে গিয়াছেন তাহার একটা কারণ আছে, স্থবির হইলেও দিদি-শাশুড়ী বেশ ডাঁটো। ফলে ওঁর মৃত্যুর কথা এখনও কেহ ভাবিতে আরম্ভ করে নাই, অন্তত মাসখানেক কি মাস দুয়েকের মধ্যে যে ভালমন্দ কিছু একটা হইবে এমন আশংকা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

বাহ্যত অবশ্য শরীরটি ধনুকাকৃতি হইয়া গিয়াছে এবং গলার স্বর হইয়া গিয়াছে টানা এবং তরঙ্গায়িত; কিন্তু এই স্বর এবং শরীর

লইয়া এখনও মস্ত বাড়িটিতে খুটখুট করিয়া বেড়ান। সংসার অনভিজ্ঞতার জন্য কন্যাকে সাক্ষাৎভাবে এবং জামাতাকে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করেন, নাতি-নাতবৌয়ের সঙ্গে বিদ্রূপ করেন, নববিবাহিতা নাতনিকে নিজেদের জীবনের উদাহরণ দিয়া দাম্পত্যশাস্ত্রে তালিম দেন। শরীর ভেদ করিয়া বয়স যে মনের কোনখানটা স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভালবাসার ক্ষমতাও বেশ অটুট আছে, এখন সবচেয়ে বেশি স্নেহ নাতির ছেলেটির উপর। বড়মা দাঁড়াইলে তাঁহার মাথা উপরদিক হইতে ঝুঁকিয়া প্রপৌত্রের মাথার উপরটিতে আসিয়া পড়ে,—মনে হয় জীবনের দুই দিক মিলিয়া একটি পূর্ণ বৃত্ত সৃষ্টি হইল।

এই দিদি-শাশুড়ী এখন শয্যাধরা। হারাধন ডাক্তার বলিতেছে কোন উপসর্গ নাই তেমন, তবে বয়েস হইয়াছে, যে কোন মুহূর্তেই একটা উপসর্গ দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, তখন আর সামলান যাইবে না। খুব সাবধান থাকাই ভাল, বিশেষ করিয়া খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে।

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অবশ্য কোন ভয় নেই। শেষ বয়সে এটা ওটা সেটা খাইবার জন্য একটু লালসা হয় বটে, কিন্তু দিদি-শাশুড়ীর ওসব বিষয়ে রসনা খুব সংযত। যাহা সামনে ধরিয়া দেওয়া হয় শান্তশিষ্ট ছোট মেয়েটির মত নির্বিচারে নিঃশেষ করিয়া একঘটি জল পান করিয়া উঠিয়া পড়েন। আহার সম্বন্ধে কখন একটা সাধ-আহ্লাদ কেহ দেখে নাই। যে-মন লইয়া নিমন্ত্রণে বসিয়াছেন, ঠিক সেই মন লইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন সাগু-বার্লীর বাটি। চির-কালই এইভাবে কাটিল।

বরং নাতবৌয়ের সাধ হইয়াছে, মেয়ের সাধ হইয়াছে, "আজ তোমায় এটা করে দিই দিদিমা,...মা, তুমি কখনও মুখ ফুটে বললে না তো এটা করে দে, কি সেটা করে দে ; আমাদেরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে বাছা ?"

বৃদ্ধা বলেন, "শোন কথা !—আমার সাধ-আহ্লাদের কসুর কি বাছা ? আমার কি একটা মুখ ? এতগুলি মুখে আমি কত রকম

কি খাচ্ছি—রোজই, নিতুই...আমার এই খাওয়াই বজায় রাখুন ঠাকুর···এই বুড়ো বয়সে নিজের নোলা নিয়ে থাকব গা?—কি ঘেন্নার কথা!...."

সেই লোক বেশ একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। আহারে রুচি নাই। অমন মেজাজ, অত হাসিখুসি—সব গিয়াছে যেন। বেশ একটু খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছেন। বধূ যতটা পারে পরিচর্যা করে, কিন্তু একাদিক্রমে বরাবর তো বসিয়া থাকিতে পারে না। বধূ বড় একটা ঘেঁষে না, কখন আসিয়া একটু পা দুটা টিপিয়া দিল, কি গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, তাহার পর একটা ছুতানাতা করিয়া সরিয়া পড়িল।—সে এখন একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ কুড়াইয়া বেড়াইতে চায়, একটু সরস আলোচনা চায়। কি করিবে? ভালই বল, চাই মন্দই বল—বয়সের ধর্মই এই।

কাছে কাছে থাকে নাতির ছেলেটি। আর সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বুড়ীর কোন গোল থাকে না। সে না থাকিলেই ক্রমাগত গজ-গজ চলিতে থাকে—অনুযোগটা চলে মেয়ে-জামাই লইয়া—আজ এ যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইত তো কি এভাবে ফেলিয়া তীর্থ করিতে যাইতে পারিত? হাজার কর মেয়ে মেয়েই, জামাই জামাই-ই—কথায় বলে—জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা... হ্যাঁ, নিজের পেটের মেয়েই পর হল, নাতি-নাতবৌদের ভরসা!—স্বর্গে বাতি দেবে!...

বধূ বোঝে—ছেলে কাছে নাই; এত কথার মূলে ঐটুকু কেন না ছেলে জামাই, নাতি, নাতবৌ, নাতনি—সব ঐ নাতির ছেলেটিতে জমা হইয়াছে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলেটিকে বসাইয়া আসে। বলে, "আমি এই এলাম বলে দিদিমা—ঠাকুরপোর ভাতটা বেড়ে দিয়ে" কিংবা—"তোমার নাতির জামাটায় বোতাম ক'টা বসিয়ে এক্ষুণি এসে বসছি···"

হয়তো আসিতে পারে না। ঐ বোতাম সেলাই-ই একটি কাজ হয় তবে তো? আবার কাজের চেয়ে অকাজের হিড়িক আরও

বেশি। খুকির পা হওয়া পর্যন্ত মাকে হেঁসেল থেকে পুজোর ঘর পর্যন্ত সর্বত্রই সাহায্য করিতে সদা ব্যস্ত—কোথায় কোন্ ঘটনা ঘটাইয়া বসিয়া আছে কে জানে? নাতবৌ-এর অনুপস্থিতিতে কিন্তু ক্ষতি হয় না। খোকা আসিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। কথার অফুরন্ত প্রবাহ আরম্ভ হইয়া যায়। সে-সব কথার অবশ্য মাথামুণ্ডু কিছুই থাকে না—এমন কোন কথাই থাকে না—সংসারের অভিধানে যাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহা না থাক, কিন্তু অনর্থ থেকে বাঁচায় এই সব কথা—বধূ নিশ্চিন্ত থাকে।

সংসারে প্রয়োজনের মূল্য বেশি, না অপ্রয়োজনের?—মনে হয় দুই-ই তুল্য-মূল্য। প্রয়োজনের সংসার সে তো অপূর্ণ, তাহাকে পূর্ণতা দিয়েছে অপ্রয়োজনের বিলাস। জীবনকে ঘিরিয়া আছে শৈশব আর জরা,—যেমন দিনকে ঘিরিয়া আছে উষা আর সন্ধ্যার স্বর্ণরাগ। দুই-ই অপ্রয়োজন কিন্তু এই দুই-ই দিয়াছে পূর্ণতা।

হারাধন ডাক্তার আবার আসিয়াছিল, উপসর্গ এখনও কিছু পায় নাই; তবে অরুচির কথা শুনিয়া বলিল, ওটা ভাল লক্ষণ নয়। আহারে শক্তিহ্রাস হইতে হইতে শেষে রোগিণী বে-এক্তিয়ার হইয়া যাইবে। বলিয়াছে গুরুপাক না হয় এবং অধিক আহার না করিয়া ফেলেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মুখরোচক পথ্য তৈয়ারী করিয়া দিতে। ডাক্তারেরা সব বয়সের রোগীকে এক নজরে দেখে না। সোজা না বলিলেও পাকে-প্রকারে বুঝাইয়া দিল—মুখরোচক করিতে গিয়া যদি একটু হয়ই গুরুপাক তো বিশেষ আপত্তি নাই তাহার। আর চাপ হওয়ার ভয়ে নিক্তির ওজনে খাওয়ানরও দরকার নাই। মোট কথা, পথ্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা বিঘ্নই রহিল না! নাতবৌ ময়ান না দিয়া লঘুপাক করিয়া খানকতক লুচি প্রস্তুত করিল, অল্প ঘৃত দিয়া একটু হালুয়া তৈয়ার করিল। দিদি-শাশুড়ীর সামনে ধরিয়া বলিল,

"নাও, দু'খানা মুখে দাও দিকিন দিদিমা। আজ আর সাবু আনিনি ...নাও, ওঠ একটু।"

ঠিক দেড়খানি লুচি, আর আধ ছটাক হালুয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিয়া বৃদ্ধা মুখ ঘুরাইয়া বসিলেন। নাতবৌ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"ওকি হল! এরকম করে খেলে আর ক'দিন টেঁকবে?—বিছানার সঙ্গে যে মিশে গেছ দিদিমা!"

বৃদ্ধা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আর টেঁকা, একেবারে ভাল লাগছে না বৌ এসব।"

"কি ইচ্ছে করে খেতে তাই না হয় করে দিই দিদিমা, ডাক্তারে তো সবই খেতে বলেছে—বেশি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে?"

"না বাছা, মিষ্টির নামে গা ঘিন ঘিন করছে।"

"তেতো?—তেতোটা ভালও তোমার পক্ষে। বলতো উচ্ছে দিয়ে ভাল করে শুক্ত করে দিই না হয়?"

"মুখ যেন আপনিই তেতো হয়ে রয়েছে..."

"নোন্তা?—খানকতক সিঙাড়া দোব করে দিদিমা? দিই না।"

"রক্ষে কর বাছা—নুনের দিকে যেন চাইতে ইচ্ছে করছে না।"

"তবে কি করব? টক, ঝাল তো দেবে না ডাক্তার—আমি তিন রকমই করে রাখব দিদিমা, যেটা ভাল লাগে মুখে দিতে হবে। না দিলে চলবে কেন গা? গায়ে একটু বল পাওয়া চাইতো। এই ওষুদ গেলার মতন করে একটু দুধ খাও, ওতে আর কি হবে বল?"

"ওতেই ঢের হবে। আমার মেয়ে-জামাই যেমন ছেড়েছে, যমেও তেমনি ছেড়েছে বৌ; তোদের ভয় নেই।... খোকাটা গেল কোথায়?—ডাক দিকিন্। খুকুর হাতে দিয়েছিস একখানা লুচি?"

খোকাকে ডাকিতে হইল না। আহার্য সম্বন্ধে তাহার একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে, তিন ক্রোশের বাহির হইতেও টের পায়। আসিয়া উপস্থিত হইল, মা বলিল, "জুটেছ গন্ধ পেয়ে? বসতে

পার না বড়মার কাছে একটু? পিসিমা কোথায়—খুকুটাকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে গেছে বুঝি?—একটু আক্কেল থাকতে হয় তো মানুষের? যেমন পিসি তেমনি ভাইপো।”

দিদি-শাশুড়ী একটু খিঁচাইয়া বলিল, “তুই আগে দে তো ওর হাতে দু’খানা। এসে বেচারি যেন ভয়ে জবু-থবু হয়ে দাঁড়াল। পরের আক্কেল দেখতেই ব্যস্ত।”

খোকা আগাইয়া আসিতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে আসিল যেন; হাতটা তুলিতে গন্ধটা আরও তীব্র এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মা বিস্মিতভাবে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, “আচারের গন্ধ যে গায়ে হাতে রে খোকা।”

খোকার বছর চারেক বয়স হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত গোটাকতক ব্যঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই; সেইজন্য তাহাকে বয়সের অপেক্ষাও শিশু এবং অত্যন্ত নিরীহ মনে হয়। ভীতভাবে চাহিয়া বলিল, “ডাঃ আমিটো ঠাই নি।”

“না, ঠাও নি! তবে গন্ধ ভুর-ভুর কচ্ছে কিসের?—হাঁ করতো দেখি।”

খোকা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বড়মার দিকে চাহিল। তিনি একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, “একখানা লুচি হাতে দিবি কি না দিবি,—তা ডেকে ছেলেমানুষকে অত শাসন করবার কি দরকার র‍্যা? আ গেল যা! যা খোকা খেলগে যা—আর হাঁ করে বেয়াকুব হতে হবে না....আচার আচার একটা যেন রব উঠেছে—ঝি আচার চুরি করছে, মেয়ে আচার চুরি করছে, ঐ দুধের ছেলে আচার চুরি করছে—কোন দিন বলবি আমিও মরবার সময় তোদের আচার চুরি করে যমের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করছি!”

বধূ বলিল, “তুমি রাগ করছ দিদিমা, কিন্তু সত্যিই ভ্যাক্ করে আচারের গন্ধ বেরল ও আসতেই, তাই বললাম। আচারগুলো খেটে খুটে করলাম অথচ যেন উবে যাচ্ছে। কে যে সরাচ্ছে, কোন মতেই ধরতে পারছি না। কাঁচা-মিঠে আমের সেই মিষ্টি আচারের

শিশিটাই পাওয়া যাচ্ছে না। ও-আম পাওয়াই যায় না, অনেক কষ্টে গুটি-কতক যোগাড় করেছিলাম।"

ছেলেমানুষ দেখতেই দিদিমা, কোন গুণে ঘাট নেই। আমি নিশ্চিন্দি থাকি তোমার এখানে রয়েছে, আর…"

বুড়ী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। অর্ধ-শয়ান হইয়া উঠিয়া বলিল, "তোর যদি এই সন্দেহ হয়ে থাকে বউ যে আমি তোর ছেলেকে চুরি বিদ্যা শেখাচ্ছি তো নিয়ে যা এখান থেকে। দিস নি থাকতে আমার কাছে। অপরাধের মধ্যে বলেছি ওই দুগ্ধপুষ্যি শিশু ও চুরির কি জানে? তা তুই কত কথাই না শোনালি আমায়। ছেলেটা যে আসে কাছে সেটা তোদের পছন্দ নয়। আমার কাছে এসে বিগড়োয়, নিয়ে যা সরিয়ে। আমি জানি শিশুর মন দেবতার মন, ওদের মনে পাপ ঢোকে নি; তোর যদি সন্দেহ মিছে কথা বলছি, তোর যদি বিশ্বাস ও করেছে চুরি, নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলগে, তবে আমার চোখের সামনে আর শাসন করিস নি। যা নিয়ে যা, যা খোকা, আর আমার কাছে আসিস নি; বলে নিজের মেয়েই যার ভুললে, তার আবার নাতি-নাত্‌কুড়ের ভরসা।"

দিদিমাকে এতটা চটিতে কখন দেখা যায় নাই। প্রবল উত্তেজনায় বালিশে বুক চাপিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। নাতবৌ কিন্তু বিস্মিত হইল না, আসিয়া পাশে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বলিল, "আমারই ভুল হয়েছে দিদিমা. তুমি চুপ কর; কাহিল হয়ে পড়বে। সত্যিই তো, কচি ছেলে ও চুরির কি জানে গা!"

চোর তাহা হইলে ধরা পড়িয়াছে। বড়মাকে ঠকাক্, কিন্তু মা ঠকিবার বান্দা নয়, এখন ভাল করিয়া সব কথা বাহির করা দরকার। এত আচার যায় কোথায়? সরায়ই বা কখন? বড়মার ঘরের পাশের ঘরটিতে আচার থাকে একটি কুলুংগিতে; তেপাই কি

জলচৌকির সাহায্য না লইয়া খোকার কর্ম নয় হাত দেওয়া। বড়মার প্রায় চোখের সামনেই খোকা এতটা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে এর মধ্যে অন্য লোক আছে, আর খোকা আছে সহযোগিতায়। বড়মার তন্দ্রা নিদ্রা বা অন্যবিধ সুযোগে সে খবর পৌঁছায়, মূল তস্কর আসিয়া চুপিসাড়ে কার্য সিদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়ে। এই মহামতিটি কে? এ-বাড়ির ঝি? ও-বাড়ির নন্দলাল? ছেলেটি আসিয়া খোকা আর খুকীকে লইয়া প্রায় ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাহা ভিন্ন আচার সম্বন্ধে একটু দুর্বলতাও আছে, বধূ যখন আচার তৈয়ারি করিতে বসে, টের পাইলে খানিকটা আদায় করা চাই। ও-বাড়ির ঝি-মাগিটাও হইতে পারে; কিংবা এও হইতে পারে, দু-বাড়ির দুই ঝি আর নন্দলাল সবাই এর মধ্যে আছে, সুযোগ অন্বেষণের জন্য খোকাকে ঘাঁটিতে বসাইয়া রাখিয়াছে, মাঝে মাঝে ঘুসটা-আসটা দেয়। না, সন্ধান লইতে হয়, কিন্তু দিদি-শাশুড়ীর সমক্ষে সে হওয়া অসম্ভব,—মেজাজ অসম্ভব রকম খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই খোকাকে আহার করাইয়া দেওয়া হয়। ননদ ওঘরে দিদি-শাশুড়ীর কাছে আছে। শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া বধূ খোকাকে খাওয়াইয়া দিতেছিল। সকলেই জানেন ব্যাপারটি বেশ আয়াসসাধ্য। মায়ের বাকচাতুরীর যত শক্তি এ-অবস্থায় কাজে লাগাইতে হয়। মা অন্নের গ্রাস পাকাইয়া রাখিয়া বলিতেছিল, "নাও। আমি এই ভাগ করে দিচ্ছি—এই এটা আম, এটা জাম, এটা সন্দেশ, এটা হল চন্দ্রপুলি, এটা... এটা..." ছেলে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "শাশুড়ীর মাটা মা?"

ওটা ছেলের দৈনিক আহার্য, মারই সন্ধান দেওয়া, তবে আজ মনে পড়ে নাই; বলিল, "হ্যাঁ, শাশুড়ীর মাথা। খেয়ে নাও দিকিন শীগ্‌গির ক'রে। তবে তো জোর হবে, তবে তো ঘোড়ায় চড়ে খুকুকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেবে। খেয়ে নাও...কী লক্ষ্মীই হলো খোকা আমাদের গা..."

খোকা একটি গ্রাসের অর্ধেক শেষ করিয়া গভীরভাবে একটু টানা সুরে আত্মপ্রশংসা করিল, "কেমন আটার টুরি করে না!..."

মা হাতে একটা গ্রাস তুলিতেছিল, ছেলের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেমন যো বুঝিয়া নিজের দোষ স্খালন করিয়া লইতেছে ধূর্ত! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, এই ছেলেরই মা তো? গ্রাসটা রাখিয়া দিয়া পিঠে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "হ্যাঁ, কেমন আচার চুরি করে না! খোকা কি আমাদের চোর? চুরি করে তো ঝি, নন্দ, না খোকামণি? ঝিয়ের নোলা খন্তি দিয়ে পুড়িয়ে দোব খন, ছ্যাঁক করে উঠবে, কি বল খোকা?...নাও।"

খোকা গ্রাসটা মুখে লইয়া মাথা নাড়িয়া ছ্যাঁকা দেওয়ার দণ্ডটা অনুমোদন করিল।

মা বলিল, "খোকা আমার লক্ষ্মী আর যত চোরেরা খোকাকে দুষ্টু করতে চাইছে, না খোকা?"

খোকা বড় ভাল ছেলে হইয়া পড়িয়াছে; খুব জোরে মাথা নাড়িল, অর্থাৎ হ্যাঁ সে লক্ষ্মী এবং চারিদিক থেকে ক্রমাগত তাহাকে দুষ্ট করিবার ষড়যন্ত্রই চলিতেছে বটে।

কি যেন একটু ভাবিল এবং তাহার পর বড় বড় চোখ দুইটা মায়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "বড়মা টো টোর নয় মা।"

মা হাসিয়া বলিল, "না বড়মা চোর হতে যাবে কেন? বড়মা খুব লক্ষ্মী, আমার যাদুকে কত আদর করে।"

খোকা নিজের বেলার মত আবার সুর করিয়া বলিল, "কেমন আটার ঠায় না..."

মা একটা গ্রাসের দলা পাকাইতেছিল, থামিয়া গিয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিল। খানিকক্ষণ মনে মনে কি যেন মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিল, রহস্যটা কি পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে? আবার গ্রাসটা তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "না, খোকা না দিলে বড়মা আচার তো খায় না। ভাগ্যিস খোকা এনে দেয়..."

খোকা একবার সংশয়িত দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল। তাহার পর একটু স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "না, এনে ডিনা টো।"

মায়ে বেটায় বুদ্ধির লড়াই চলিয়াছে।

মা মনে মনে হাসিল। বলিল, "আহা, দেবে না এনে খোকা? বড়মা কত বুড়ো হয়েছে, কত ভালবাসে—"

পুত্র এবার হারিল; তবে একেবারে নয়; বলিল, "হ্যাঁ ডোব।"

"নে খা; কি করে দিবি খোকা? কুলুংগিতে তো তোর হাত যায় না।"

খোকা একটু পৌরুষের স্বরে বলিল, "ঘোঁড়ায় টড়ে।"

মায়ের মনে পড়িল দিদি-শাশুড়ীর ঘরে একটি তেপাই আছে, সেটি খোকার কল্পলোকের অভিযানে পক্ষিরাজের কাজ করে। সব বোঝা গেল। দ্বিপ্রহরে যখন সে দিদি-শাশুড়ীর ভরসায় কাজকর্ম সারিয়া একটু বিশ্রাম লয়, ঠিক সেই সময় দিদি-শাশুড়ীরই প্ররোচনায় খোকা তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া আচার সংগ্রহ করে। সে আচার যে কি হয় তাহাতেও সন্দেহ রহিল না। যতদিন সামর্থ্য ছিল, নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, অসুখটা তাহারই পরিণাম। নিজে শয্যাধরা হইয়া প্রপৌত্রকে দলে টানিয়াছেন, তাই অসুখেরও বিরতি নাই।—নির্লোভ মানুষ, সত্যই সুসংযত, নির্লোভ, তাহারই মধ্যে এই একটি দুর্বলতা। একি বার্ধক্যের শেষ স্পৃহা? না, সারা জীবনের সুকঠোর নিস্পৃহতার অন্তরালে এ দুর্বলতাটুকু চিরকালই ছিল? না, জরায় যে আবার করিয়া শৈশবকে ফিরাইয়া আনে এ তাহারই নবপরিচয়?—বোধ হয় তাহাই—সেইজন্য আর সবাইকেই ছাড়িয়া দিদি-শাশুড়ী খোকাকেই আশ্রয় করিয়াছেন! কেননা জরার সাথী শৈশবই, জীবন যেখান হইতে যাত্রা করে আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া নিজের বৃত্ত পূর্ণ করে।

পরের দিন সতর্কভাবে দিদিমার বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গদির নিচে হইতে একটা বড় কৌটা আর একটি মাঝারি গোছের শিশি বাহির হইল, কৌটাটিতে দু'তিন রকমের আচার, শিশিটিতে সেই

হারানো কাঁচা-মিঠা আমের মোরব্বা। বধূ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, এইভাবে বলিল, "দেখছ খোকার কাণ্ড দিদিমা! তোমার চোখে ধুলো দিয়ে—এই দেখ—তাইতো বলি?—"

দিদিমা দেখিলেন, অবশ্য একটু বক্র-দৃষ্টিতে! আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আর এই আমারই বিছানার তলায়!"

"তাইতো দেখছি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। দুষ্টুর আস্পদ্দা কম নয় তো!"

দিদিমা নরমস্বরেই বলিলেন, "তা, কিছু বলিসনি যেন বউ, মাথা খাস আমার।—কই কিসের আচার করেছিস দেখি?—কাঁচা-মিঠে ঐটে? আজকাল তোর আচারে হাত কেমন হয়েছে কে জানে—"

"তোমার যে অত্যাচার হবে, নৈলে দিতাম একটু করে।"

দিদি-শাশুড়ী খুব আগ্রহ দেখাইলেন না। সেই জন্যই বোধ হয় মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে বড় একটা নিরাশা রহিয়াছে। বলিলেন, "পোড়াকপাল, আমাদের আবার অত্যাচার বৌ—থাক কাজ নেই—"

বৌ অন্যমনস্ক হইয়া একটু ভাবিল। অত্যাচার!—খোকা-খুকি যখন তাহার মধ্যে সম্ভাবনার আকারে, তখন সে নিজে কোন্ এ কথা ভাবিয়াছিল? থেঁতো-করা আম, কুলে-ঝালে সেও তো অত্যাচার। টক আর ঝাল, মেয়েছেলের চিরদুর্বলতা। এইখানে সব মেয়েদেরই রসনায় রসনায় একটা গূঢ় সখিত্ব আছে, বয়সের প্রভেদ নাই! বধূ ভাবিল তা ভিন্ন অভ্যাসটা একেবারে ছাড়ান ভালো নয়। বলিল, "তোমার মুখের যে রকম অরুচি হয়েছে দিদিমা, বলত একটু করে দিনের বেলায় পথ্যির সঙ্গে না হয় দিই,...কিন্তু খোকাটাকে দেখ বাপু...আমি তেপাইটাই ঘর থেকে নিয়ে যাই, কি বল?"

নাম-মাহাত্ম্য

সারাটা বছর স্রেফ আড্ডা দিয়া যখন কুড়িটি দিন বাকি, নেড়া-মন্দিরের বুড়ো শিবের শরণাপন্ন হইলাম। পয়সা নয়, সিকি নয়, বাতাসা নয়, রোজ একটি ঝুড়ি করিয়া বিল্বপত্র, আর পাশ থেকেই এক ঘটি করিয়া গঙ্গাজল।....পাশ করিয়া গেলাম। নিতান্ত মন্দও হইল না—সেকেণ্ড ডিভিশ্যন। বেশ বোঝা গেল আরও দশটা দিন আগে যদি বাবাকে মনে পড়িত, ফার্স্ট ডিভিশ্যনটা বাঁধা ছিল। যাক, ধর্মপথে পা দিয়া বেশি লোভটাও আবার কিছু নয়।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর পড়বি শৈলেন ?"

আমাদের বাড়ির সামনেই ধর্মদাসের বেলগাছটা। সবুজের একটি চিহ্নমাত্র কোথাও রাখি নাই। ধর্মদাসরা নেহাত এখানে নাই তাই সম্ভব হইয়াছে। এমন করিয়া গাছ মুড়াইবার সুযোগ তো বারে বারেই পাওয়া যাইবে না ?

গাছটার উপর থেকে দৃষ্টি সরাইয়া বলিলাম, "না বাবা, পড়ে যে এমন কি হবে তা তো বুঝতে পারছি না।"

"তবে ? করবি কি ?"

"একটা ব্যবসা-ট্যাবসা আরম্ভ ক'রে দিলে মন্দ হ'ত না বোধ হয়।"

"কিসের ব্যবসা করবি ভাবছিস ?"

কোন্‌টার করিব তাহাও ভাবি নাই, কোন্‌টার যে না-করিব তাহাও ভাবি নাই। বলিলাম, "কিছু স্টেশনারি থাক্, বলেন তো কিছু কাপড়-চোপড় রাখি,—একপাশে চাল-ডাল, বেণে-মসলা এসবও থাক্—যেটার কাটতি দেখব সেটাকে রেখে বাকি ছুটো সরিয়ে দিলেই হবে। আপনি কি বলেন ?"

নূতন উৎসাহের মুখে বাবা আর বাধা দিলেন না, নির্বিকারভাবে "বলিলেন, দেখ্ তবে।"

রাত্রে মা বলিলেন, "বলছিলেন—একসঙ্গে অতগুলো জিনিস সামলাতে পারবি ?"

বলিলাম, "বুড়ো শিবের যদি দয়া থাকে তো চলে যাবে মা ?"

নবজাগ্রত ভক্তি আর বিশ্বাসের মুখে মাও আর নিরুৎসাহ করিলেন না। বলিলেন, "সে ত ঠিকই, বাবা চাইলে কি না হ'তে পারে। বেশ দেখ্ চেষ্টা ক'রে তাহ'লে।"

এটা গেল ভক্তি আর বিশ্বাস উদ্গমের ইতিহাস! এতদিনে দুইটাই বোধ হয় যাইতে বসিয়াছে ; এইবার তাহার ইতিহাস শুরু করি।

ঠিক ভক্তি আর বিশ্বাস যাইতে বসিয়াছে বলাটাও আমার ভুল হয়। যাইতে বসে নাই, আসলে আধার পরিবর্তন করিয়াছে। আগে ছিল দেবদেবীদের উপর, এখন আশ্রয় করিয়াছে...এঁদের কি বলিব ? অভিধা লইয়া একটু মুশকিলে পড়া গিয়াছে। মনুষ্য-লোক ছাড়িয়া এঁরা জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেছেন, আরও কি কি লোক আছে এবং কোন্ লোকে যে শেষ পর্যন্ত এঁদের অধিষ্ঠান, কি করিয়া বলিব ? সুতরাং ঐটুকু খালি রাখিয়া আপাতত কাহিনী-টাই বিবৃত করিয়া যাই।—

খুব সদর জায়গা দেখিয়া একটা ঘর ভাড়া করিলাম। চারিটা বড় বড় সড়কের উপর চৌমাথা। ওদিক থেকে হাওড়ার বাস্ আসিয়া দাঁড়াইতেছে, এদিক থেকে চন্দননগর ভদ্রেশ্বরের। সব রকম লোকের গতায়াতে গুলজার জায়গা। আর কাজের জায়গা—যাকে বলা চলে গঞ্জ। শতকরা পাঁচটা লোককে ভ্যাগাবণ্ডের দলে ফেলিলেও বাকি পঁচানব্বই একটা-না-একটা কিছু কিনিবেই, চাল, ডাল, নুন, তেল, মসলা, কাপড়, গেঞ্জি, লুঙ্গি, নস্য, চিমনি, হর্লিক্স, বারসোপ, ডিম,

—কোন জিনিসটার জন্যই অন্য দোকান মাড়াইতে দিব না।....পাঁচু ঠাকুরের দোর ধরিয়া আমার জন্ম, সমস্ত ছেলেবেলাটা মা-শীতলার চরণাশ্রিত ছিলাম, জীবনের প্রথম তোরণ উত্তীর্ণ হইলাম বুড়ো শিবের কৃপাদৃষ্টির জোরে—ওঁদের দয়াই আমার মূলধন ;—সব শুভার্থীদের পরামর্শানুসারে এবং নিজের অন্তরের আশা এবং বিশ্বাস লইয়া দোকানের নাম রাখিলাম "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার।" কলিকাতা থেকে প্রকাণ্ড ঝকঝকে সাইনবোর্ড আনিলাম। বাঁ-দিকে একটা বড় বৃত্তের মধ্যে একটা চিত্র—কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি শিব অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দেবী প্রসন্ন আননে একটা সোনার হাতায় করিয়া অন্ন পরিবেশন করিতেছেন।...ভক্তির দৃষ্টিতে দেখুন চক্ষু ফিরাইতে পারিবেন না; নিতান্ত আধুনিক ইকনমিক্সের দৃষ্টিতে দেখুন—ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের অর্থাৎ প্রয়োজন আর আয়োজনের এমন উচ্চ অঙ্গের প্রতীক খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ।

কথায় বলে দেব-দ্বিজে ভক্তি। পাঁজি দেখিয়া খুব একটা ভাল দিন বাছিয়া পাড়ার বাছা বাছা গুটি বারো পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে আহারে দক্ষিণায় পরিতুষ্ট করিয়া দোকান খুলিলাম। অবিলম্বেই মাথায় আর একটা বুদ্ধি আসিল। ঘরটা বড়ই পাইয়াছিলাম, হাত-তিনেক চওড়া আর হাত-ছয়েক লম্বা একটা জায়গা বাহির করিয়া লইয়া আমকাঠের তক্তা দিয়া আলাদা করিয়া লইলাম। মাঝখানে একটা অয়েলক্লথ-মোড়া লম্বা টেবিল, একপাশে খান-ছয়েক টিনের চেয়ার। শেষের দিকে একটু খুবরিগোছের ঘিরিয়া লইয়া চা, ডিম, চপ, আর ঢাকাই পরোটার আয়োজন করিলাম। এটুকুর আলাদা করিয়া নাম দিলাম "অন্নপূর্ণা কেবিন।" বাবা বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, চক্রবর্তীমহাশয় বুঝাইলেন, "তা হোক, মা'র নাম করে করেছে, সব শুদ্ধ হয়ে যাবে।"

'শৈল দোকান করেছে—শৈল দোকান করেছে' বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই একটা রব উঠিয়া গেল! দোকান দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিল। সামনেই রাস্তার ধারে একটা ছোট বকুলতলায়

এক ফালি ঘাসে-ঢাকা জায়গা। বিকালে রোদ পড়িয়া আসিলেই কতকগুলি টিনের চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হয়। এ-পাড়া ও-পাড়া মিলাইয়া যত শুভার্থীরা আসিয়া এই সময় উপস্থিত হন। চক্রবর্তী-মশাই, ঘোষাল-মশাই, বৈকুণ্ঠ-কাকা, নটবর-কাকা, সনাতন চৌধুরী, ও পাড়ার অবিনাশ-ঠাকুর্দা, গোঁসাই ঠাকুর—এঁরা প্রায় নিয়মিতই পায়ের ধূলা দেন, এর ওপর যাওয়া-আসা, কর্তাদের সঙ্গে দু'-একটা আলাপ-আলোচনা করা, প্রসাদী তামাকে দু'-একটা টান দিয়া যাওয়ার লোক তো লাগিয়াই রহিয়াছে।

অন্নপূর্ণা কেবিনের "বয়" হারানের তো তামাক সাজিয়া দম ফেলিবার ফুরসত থাকে না। ভালমন্দ নানা রকম আলোচনায়, হাসিঠাট্টায়, তামাকের সুবাসে আমার দোকান যেন গমগম করিতে থাকে। হয়ত চক্রবর্তী খুড়ো তামাক টানিতে টানিতে সাবাসি দিবার ভঙ্গিতে আমার দিকে বাঁ-হাতের তর্জনীটা উচাইয়া বলিলেন, "না, বুকের পাটা আছে শৈলর: কি বয়েস বল? নয় পাশই করেছে, কিন্তু আমাদের কাছে তো সেই বালকটিই? তা কি রকম ফলাও ক'রে দোকানটি ফেঁদেছে দেখ!...ঠিক চলে যাবে, এই আমি প্রাতর্বাক্যে বলছি।"

এতগুলো কথার উপর খাতির দেখাইয়া বলিতেই হয়; "অনেক ছাতু গুলেছি চক্রবর্তী-কাকা, সামলাতে পারব তো? ভাবনা হয় এক-একবার..."

চক্রবর্তী একটু ধমকের সুরে বলেন, "আস্পদ্দা কম নয় তো। তুই সামলাবি? তবে সাইনবোর্ডের ওপর সোনার হাতা ধরিয়ে ও বেটীকে বসিয়ে রেখেছিস কি করতে?—যার ভাববার সে ভাবছে বাবা, তুই বসে বসে তামাসা দেখ।—বলে সামলাব কি করে—উনি সামলাবার মালিক যেমন!—কথা শুনছ নটু?"

নটবর-কাকা হুঁকার জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিলেন, "একটা কথা দাদা লক্ষ্য করেছ কি না বলতে পারি নে; জায়গাটার যেন চেহারাই বদলে গেছে।—না; বড় দোকান তো এখানে আগেও ছিল

গো,—এই ঘরেই, কিন্তু এমন জলুসটি কখনও দেখেছ? মা যেন আলো করে বসেছেন।"

ঘোষাল-মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর ছোট নাতিটি থাকে, তাহার কাজ ঠাকুরদাদার হাঁটু জড়াইয়া ক্রমাগতই একটা-না একটা বায়না ধরিয়া থাকা। তাহাকে ধমক দিয়া ঘোষাল-মশাই বলেন, "চপ্ ল্যাবাঞ্চুস্ কি আমি হাতে করে বসে আছি?...যা না তোর শৈলকাকাকে বল গে যা না, তাতে ছেলের লজ্জা!—দেখ হে শৈলেন, তোমার ভাইপো কি বলে।—মায়ের কথা উঠল বলেই বলছি—কেন, এইখানে তো হারাধন কুণ্ডুর ছেলে মতি দোকান ফেঁদেছিল, তারপর সেই মেড়োর কাপড়ের দোকান, তারপর আমাদের মোল্লা-পাড়ার এছানুদ্দিনের ছোটভাই জুতোর দোকান খুললে—দোকান ছিল না কি করে বলব? একজন-না-একজন তো রয়েছেই একটা কিছু নিয়ে—কিন্তু কখন এসে বসতে দেখেছ? না, তোমাদেরই কাউকে কখন দেখেছি দোকান মাড়াতে? আর এখন যেন টানে এই বকুলতলাটি। তার হেতু আর কিছু নয়—ঐ নাম আর সাইনবোর্ড। ওর পেছনে কত বড় একটা হিঁদুয়ানি রয়েছে, কত বড় একটা নিষ্ঠা। এলেই যেন মনে একটা..." বোধ হয় নাতিটি ততক্ষণে ফিরিল। ঘোষাল-মশাই হাত দুইটা ত্রস্তভাবে উঁচাইয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ এদিকে নয়; তুমি ওসব চপ-টপ খেয়ে হাত ধুয়ে তবে এস বাপু। চা খেয়েছিস?—না, আবার চায়ের জন্যে আবদার ধরবি?—মার্বেল?—সে এখন নয়, যাবার সময়; সর্বদাই ভ্যান্ ভ্যান্ করিস্ নি বাপু, মনে করি শৈলর দোকানে পাঁচটা ভাল লোক এসে বসে, দুটো ভাল কথা হয়, বসি একটু গিয়ে; তা যা ল্যাংবোট জুটেছিস—"

খদ্দের জুটিলেও সকলে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করেন—সৎ-পরামর্শ দিয়া দর-দস্তুরিতে সহযোগিতা করিয়া। কখনও কখনও রাস্তা থেকেও খদ্দের ডাকিয়া তোলেন। যে কয়জন আসিয়া বসেন, লোক চিনিতে প্রত্যেকেই ঝানু।

"কি চাই রে তোর বাপু?—শাড়ি—এই দোকান।—দাও হে

শৈল, সর্দারকে ভাল একটা শাড়ি দাও দিকিন—হিন্দুস্থানীদের বারোহাতি শাড়ি—আর দেখ—”

আমি ফিরিয়া চাহিতে খদ্দেরকে লুকাইয়া হাতে কষিয়া একটা মোচড়ের ভঙ্গী করিলেন। অর্থ সুস্পষ্ট।

“তুই না দীনুর বাড়ির চাকর? সওদা করতে এসেছিস? তা যা, ভেতরে যা, সব জিনিস এখানেই পাবি। ঐ ওপরে চেয়ে দেখ্, পড়তে না পারিস ছবি চিনিস তো দেবদেবীদের?—যা ভেতরে।... দেখ হে শৈল, কি কি চায়, দীনেকে বলে দিয়েছিলাম, চাকর পাঠিয়েছে।”

দীনুর চাকরকে ফিরিতে হইল। ধারে দিব না ঠিক করিয়াছি। চক্রবর্তী-মশাইয়ের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে তিনি আবার সঙ্গে করিয়া নিজেই উঠিয়া আসিলেন। এক গাল হাসিয়া বলিলেন, “ও-সব আবার কি ছেলেমানুষি করছিস্ শৈল। একে কি ধার বলে? ধার—যেখানে পয়সা ডোববার ভয় রয়েছে। দীনের বাড়ি, কি ঘোষালের বাড়ি, কি অবিনেশ'দার বাড়ি—ওকি ধার নাকি? শৈলর ছেলেমানুষি দেখ অবিনেশদা'।—নে, কি কি নিবি লিখিয়ে দে শৈলকে। আর হ্যাঁ দেখ্, কোন্ দিক দিয়ে ফিরবি?—তা একটু উবগার কর দিকিন—শৈল সেরখানেক ঘি, সের দুয়েক আটা আর আধসেরটাক চিনি দিচ্ছে, আমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাস্ দিকিন—লিখে রাখ শৈল!”

ঠিক করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, “কিছু ভাবনা নেই, দীনের ওখানে টাকা তোর ডুববে না—ডুবতে পারে না। আমি রয়েছি কি করতে?”

গোঁসাই ঠাকুর হাতে নস্য ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, “দীনে কেন, এ-দোকানের টাকা যেখানেই পড়ে থাক, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে বুঝতে হবে। এ কি শৈলর দোকান? মা'র নিজের দোকান—কুবের বেটা যার কেশিয়ার।—আমার সেই মাদ্রাজী নস্যিটা আনালি শৈল? মাগ্যি ব'লে কোন দোকানেই রাখতে চায় না এখানে।—

এই দেখ্ ; ভুলেই গেছলাম। নস্যির কথায় মনে পড়ে গেল—যাবার সময় দুটো হ্যারিকেনের চিমনি দিস তো শৈল। মনে করে দিয়ে দিস বাবা, আমি বোধ হয় ভুলেই যাব, আজ ভুললে তোর জেঠাইমা আর কিছু বাকি রাখবে না।”

বৈকুণ্ঠ-কাকা একসময়ে দোকান করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশের দাম অনেক। বলেন, “দোকান চালান এমন কিছু মহামারী কাণ্ড নয়, শৈল ; কিছু বাঁধা খদ্দের করে ফেল, ব্যস ; আর ঐ যে উটকো খদ্দের দেখছ—আজ এ-দোকান, কাল ও-দোকান, ওদের ভরসায় ব্যবসা চলে না। হাতে-কলমে করা কাজ, বোঝা আছে কিনা। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে দোকান করেছ, মা-ই সব যোগাড়যন্ত্র করে দেবেন, আর আমরাই কি বসে আছি ভেবেছ বাবাজী ? বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছি আর ভাবছি কি করে একটা ঘর বেঁধে ফেলতে পারি—”

মায়ের কৃপায় এবং শুভার্থীদের চেষ্টায় কাছাকাছি কয়েকটা পাড়ায় অনেকগুলি ঘরই বাঁধা খদ্দের হইয়া গেল। উটকো খদ্দের গোড়ায় কিছু জমিয়াছিল, ক্রমে দেখিলাম বোধ হয় রাস্তা থেকে খদ্দের টানিয়া তুলিবার জন্য, মোচড়ের ইসারা দেওয়ার জন্য খদ্দের অখদ্দের নির্বিচারে সকলেই রাস্তার এদিকটাই এড়াইয়া চলিতেছে। বন্ধুবান্ধব পরিচিত প্রভৃতি সকলের নিকটেও কথাটা পাড়িলাম। বলিলাম, “তোদের ভরসাতেই দোকান করলাম, তোরা ওদিকই মাড়াস না।”

উত্তর করিল, “একে তো এসা সাইনবোর্ড হাঁকড়েছ, ঢুকতেই ভয় হয়—মনে হয় জগন্নাথের মন্দিরেই ঢুকছি, কি কালীঘাটেই এসেছি—গা ছমছম করে—দোকানে এলাম দুটো ফষ্টিনষ্টি হল—মন খোলা করে পাঁচটা ভাল মন্দ জিনিস দেখলাম, তা নয়—ভেবে দেখ না, তোমার ঐ অন্নপূর্ণা কেবিনে ঢুকেই ডিম ওড়াতে সাহস হয় ? —তাহলেও সেদিনে যাচ্ছিলাম ওদিকেই—বউয়ের কাপড়চোপড় আর নিজেরও গোটাকতক এদিক-ওদিক জিনিস দরকার ছিল,

ভাবলাম নগদ পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেনা-কাটা, লাভাংশটা শৈলর হাতেই যাক না। গলি থেকে বেরতেই শুনি গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কবে কি বলেছেন না-বলেছেন তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি হবার উপক্রম হচ্ছে—চক্রবর্তী, গোঁসাই, নটবর, দীনু রক্ষিত আরও একপাল সব— ভাল করে দেখতেও সাহস হল না—ল্যাজ মুখে করে তাড়াতাড়ি পেছিয়ে এসে সিতু-মাস্টারের দোকানে ঢুকলাম—রক্ষে কর ভাই—"

সবিস্তারে না বলিয়া মোটামুটি ধরনটা জানাইয়া দিলাম। আমার ব্যবসায়ে ভক্তিপর্বের এই ইতিহাস—অর্থাৎ দেবদ্বিজে ভক্তিপর্বের। চার মাসের পর নূতন খাতার হিসাব নিকাশের সময় দেখা গেল চক্রবর্তী-মশাইয়ের নিকট ২১৫৷৷৶০, বৈকুণ্ঠকাকার নিকট ১০০৲, নটবর কাকার নিকট ১৭৹৴০—এইভাবে চারিদিকে একুনে হাজার দেড়েকের কাছাকাছি কর্জ পড়িয়া গেছে। মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বাবা দেশে নাই; কিন্তু আসিলে কি যে অবস্থা হইবে ভাবিয়া যেন কূলকিনারা পাইলাম না। তবুও শেষ দিন পর্যন্ত একটা আশা লাগিয়া রহিল—হালখাতায় কিছু মোটা রকম জমা হইবে, নিজের নিজের ঘাড়ের ঋণ তো সবার, সাধ্যমত হালকা করিবেই। প্রথম হালখাতার উৎসব, বেশ ঘটা করিয়াই করিলাম। চক্রবর্তী-প্রমুখ কয়েকজন সমস্ত দিন থাকিয়া সাহায্য করিলেন। কিছুতেই কার্পণ্য করিলাম না—প্রায় ১২৫টি টাকা খরচ হইল। চৌমাথাটা গুলজার হইয়া উঠিল সে রাত্রে। নটবরকাকা ছোট ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। বকুলতলায় আসিয়া দুই পা পিছনে হটিয়া সাইনবোর্ডের চিত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আহা, মা যেন হাসছেন।"

জমার অঙ্কে পড়িল নগদ সাতাশটি মুদ্রা, তেরটি অচল।

বাবা লিখিয়াছেন মাসখানেকের ছুটি লইয়া তিনি শীঘ্রই একবার আসিতেছেন। অত্যন্ত অশান্তিতে কাটিতেছে। নববর্ষের উৎসবের পর বাঁধা খদ্দের আরও জুটিয়াছে—শুভার্থীদের সুপারিস ঠেলিতেও

পারি না। চক্রবর্তী-মশাই বলেন, “তুমি বসে শুধু তামাসা দেখ, একটু যারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ সব একে একে এসে জুটবে।—কি রকম একটা নাম বেরিয়ে গেছে! যেখানেই পাঁচটা ভাল লোক—অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কথা—”

সন্ধ্যার জমায়েত আরও বিপুলতর হইয়া উঠিতেছে। টিনের চেয়ারে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাও অসুবিধা, সবচেয়ে বেশি অসুবিধা চা খাওয়া। বৈকুণ্ঠ-কাকা বলিলেন, “গরম কাপ আর ডিশ হাতে করে এক মহা ফ্যাসাদ শৈল, বসবে কি লোকে, যেন পাঠশালার নাড়ুগোপালটি হয়ে থাকতে হয়।—একটা চৌকি-টৌকি পেতে দে বকুলতলাটায়।”

সে-রাত্রে একে একে সবাই উঠিয়া গেলে চক্রবর্তী-মশাই একটা ছুতা করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, “হুঃ, একে আবদার বলে না?”

আমি বিমূঢ়ভাবে মুখের পানে চাহিতে বলিলেন, “চৌকি কেনো, চা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে—হুকুম হয়ে গেল! পয়সা লাগে না নতুন চৌকি কিনতে? খবরদার তুই নতুন চৌকি কিনবিনি শৈল। আমার একটা পুরনো আছে—কাল পাঠিয়ে দেব, এক-আধ জায়গায় মেরামত করে তাতেই কাজ চালাবি। তারপর দেখা যাবে দামের কথা,—না হয় আমার নামে ঐ বাবদে দশটা টাকা জমা করে রাখিস—”

সেইদিন দোকানে তালা দিয়া বাহির হইবার সময় একবার আপনিই যেন চক্ষু দুইটা সাইনবোর্ডের মূর্তির উপর গিয়া পড়িল, একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আপনি আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, “মা ডুবলাম এবার।”

মায়ের দয়া কি না বলিতে পারি না, তবে নিষ্কৃতি আসিল অদ্ভুত ভাবে।—

পরের দিন চৌকির প্রসাদে সুখাসীন হইয়া বসিবার সুবিধা

হওয়ায় বৈঠক আরও জমিয়া উঠিল। আমি ভিতরেই আছি। হিসাব খতাইতে গিয়া খতিয়ানের উপর দৃষ্টি আটকাইয়া গিয়াছে, —সতের টাকার বিক্রয়, তিন টাকার নগদ, বাকি ধার। চক্রবর্তী মশাইয়ের বাড়িতেই প্রায় এগার টাকার জিনিস গিয়াছে—লক্ষ্মীপূজা ছিল। চক্রবর্তী-মশাই গঙ্গাস্নানের পথে আমায় বলিয়া গেলেন, "বাড়িতে শাসিয়ে এসেছি, পুজোর একটাও জিনিস যদি অন্য দোকান থেকে নেওয়া হয়েছে শুনি তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দোব।—এক্ষুনি ফিরিস্তিটা নিয়ে আসছে ঝি, দিয়ে দিস।—না, পুজোর জিনিস ওসব 'এণ্ড কোম্পানী' কি 'লিমিটেড' ফিমিটেডের দোকান থেকে আসবে না, আমি বেঁচে থাকতে নয়—নামেই যেন একটা ম্লেচ্ছ-ম্লেচ্ছ ভাব!"

বিমূঢ়ভাবে খতিয়ানের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছি, ওদিকে চা আর গীতায় বকুলতলা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় নটবর-কাকা একটি সন্ন্যাসীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। পায়ে খড়ম, পরনে গেরুয়া, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মস্তক মুণ্ডিত। রাস্তা থেকেই বলিতে বলিতে আসিলেন, "নিয়ে এলাম বৈকুণ্ঠদাদা, আপনাকে আজ বলছিলাম না তখন?—এই এঁরই কথা। আসতে কি চান? না যো আছে আসবার?—কিছু নয় তো পঞ্চাশ জন লোকে ঘিরে আছে। আমারও জিদ ধরে গেল, বাবার পায়ের ধুলো একবার দোওয়াবই শৈলর দোকানে। কাল থেকে দরবার করে করে শেষকালে—"

'আসুন আসুন' করিয়া সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চৌকির মাঝখানে খানিকটা জায়গা করিয়া দিল। প্রসন্ন হাস্যে বাবাজী গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

চারিদিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবাজীর? কতদিন থাকা হবে? কি সম্প্রদায়ভুক্ত? কতদিন আসা হয়েছে এখানে?—"

নটবর-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, "ঐখানেই মুশকিল—বাঙালী নয়।"

সকলে চক্ষু কপালে তুলিয়া পরম সমীহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তবে ?"

নটবর-কাকা সমীহ আরও উদ্রিক্ত করিয়া বলিলেন, "মদ্রদেশীয়। বোঝেন বাংলা, তবে বলতে পারেন না।"

চক্রবর্তী-মশাই বলিলেন, "এক কথায় শংকরাচার্য, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেশের লোক বল না!"

সন্ন্যাসী সস্মিত আননে মাদ্রাজী প্রথায় ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া কথাটা অনুমোদন করিলেন। তাহার পর হাত নাড়িয়া চোখ নামাইয়া, মাথা ঢুলাইয়া বলিলেন, "উঁ উঁ গীতা গীতা, সম্প্রতি গীতা আলোচনাং ভবতু।"

নটবর-কাকা বলিলেন, "বলছেন—গীতার আলোচনা হোক।—তা বাবা, আপনার সামনে আমরা অর্বাচীনেরা যে গীতা মুখেই আনতে সাহস পাচ্ছি না—"

সন্ন্যাসী সেইরূপ স্মিত হাস্যের সহিতই অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া ইশারা করিলেন, চলুক—মুখে বলিলেন, "ভক্তিম্ ভক্তিম্।"

চক্রবর্তী-মশাই বলিলেন, "সে কথা তো খুবই ঠিক, ভক্তিই তো সব জিনিসের সার; কিন্তু তাই কি আমাদের আছে, বাবা?—ওরে শৈল, তোর হিসেব রেখে একবার আয় তো, বাবার পায়ের ধুলো নে—এত বড় একটা মহাপুরুষ এসেছেন—কত ভাগ্যে দেখা হয় এঁদের। একি আর আমাদের বাঙলা দেশের হেঁজিপেঁজি গেরুয়াধারী?"

অগত্যা আসিয়া পায়ের ধূলা লইলাম। চক্রবর্তী-মশাই আমার পিঠে হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভক্তি বলেন তো এই এর আছে; দোকান করেছে, তাতেও ঠাকুর-দেবতাদের ভুলতে পারে নি। ঐ দেখুন না"—বলিয়াই সাইনবোর্ডের চিত্রের দিকে বাবাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বাবাজী অর্ধেক বোঝা, অর্ধেক না-বোঝা গোছের করিয়া একটু হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "উন্নতিম্ উন্নতিম্—"

ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া সবাই গীতার এবং সাধারণভাবে ধর্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল এবং যখন দেখা গেল সন্ন্যাসী চক্ষু বুজিয়া ঘাড় নাড়া ভিন্ন বিশেষ কিছু করিতেছেন না, তখন আলোচনা বেশ জোর হইয়া উঠিল। কি জানি কেমন করিয়া লোকটার প্রতি আমারও ভক্তি জমিয়া উঠিতেছিল অল্প অল্প করিয়া। হইতে পারে স্বজাতি নয় বলিয়া, হইতে পারে কথা প্রায় কয় না বলিয়া, হইতে পারে মাথায় হাত দিয়া "উন্নতিম্ উন্নতিম্" বলিয়া আশীর্বাদ করিল বলিয়া, কিংবা আরও কোন নিগূঢ় অজ্ঞাত কারণেও হইতে পারে যাহার জন্য আমাদের শিরদাঁড়াটা সন্ন্যাসী দেখিলে আপনিই ঝুঁকিয়া আসে। একবার উঠিয়া কেবিনে গিয়া হারানকে বেশ ভাল করিয়া চা করিতে বলিয়া আসিলাম।

চায়ের পর বিদায় লইবার পূর্বে ফল এবং মিষ্টান্নে বাবাজীকে প্রীত করিয়া করজোড়ে বলিলাম—পরের দিন যেন সন্ধ্যার সময়ই তিনি দয়া করিয়া পায়ের ধূলা দেন। ভক্তি দেখিয়া শুভার্থী-মহলে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। নটবর-কাকা বলিলেন, "আমি কি না-বুঝেই ডেকে এনেছিলাম বাবাকে ?"

চারদিন পরে মনের কথাটা বলিবার সুযোগ পাইলাম। দ্বিজু লাহিড়ীর মেয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল, কেহ দোকানে আসে নাই। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পরে আমিও দোকান বন্ধ করিয়া যাইব, এমন সময় বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রোজই নটবর-কাকার সঙ্গে আসেন, আজ একা। আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া হারানকে ভাল করিয়া চা করিতে বলিয়া দিলাম।

বাবাজী আসন গ্রহণ করিয়া ইশারায় প্রশ্ন করিলেন,—"এরা কোথায় ?" শুনিয়া চক্ষু নাচাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ।"

তাহার পর একটু থামিয়া নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করিয়া হাতটা ঘুরাইয়া লইলেন। প্রথমটা মনে হইল বুঝি এবার দেহরক্ষা করিবেন বলিতেছেন, কিন্তু পরে বারাণসী, মথুরা এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিলাম এবার এই স্থান ত্যাগ করিয়া তীর্থ-পর্যটনে যাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাওয়া হবে বাবা?"

প্রথমে বাংলাটা বুঝিতে পারিলেন না, তাহার পর একটু যেন ভাবিয়া মানেটা ধরিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কল্যমেব—স্বপ্নাদেশং।"

স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, কালই যাইবেন। ষোল আনা খাঁটি সন্ন্যাসী, একরত্তি ভেজাল নাই...আমি একেবারে মনস্থির করিয়া ফেলিলাম। বাবাজীকে সনির্বন্ধ করজোড়ে একবার "বস্তুতাম্" বলিয়া হারানের কাছে গিয়া বলিলাম, "যা চট করে যা, ততক্ষণ উনুন ধরছে—এই টাকাটা নিয়ে ছিদামের ওখানে সব্বার চেয়ে যা ভাল খাবার আছে—আর বাদবাকির ভাল ফল—কালু শেখের দোকান থেকে—যা—আবার বেটা হাঁ করে চেয়ে রইল!..."

তাহার পর ফিরিয়া গিয়া কতকটা বাংলায়, কতকটা হিন্দীতে, কতকটা হাত-পা নাড়িয়া এবং কতকটা ম্যাট্রিকুলেশ্যন পর্যন্ত আয়ত্ত করা ঐ "বস্তুতাম্"-এর মত অপসংস্কৃততে আগাগোড়া দুঃখের কথা বলিয়া গেলাম—এমন কি লক্ষ্মীপূজার কথা, চৌকি ঘাড়ে চাপানর কথা পর্যন্ত। আবার পাছে ভক্তদের নিন্দা করিতেছি মনে করিয়া চটিয়া যান মনে মনে, সেই জন্য বলিলাম, "ওঁরা সবাই আমার খুবই স্নেহ করেন বাবা, তবে দৈব আমার প্রতিকূল; এখন সেই প্রতিকূল বিরূপ দৈব যাতে অনুকূল হয়ে ওঠেন তার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন—জলপড়া, ধুলোপড়া, বিভূতি—যা হয় একটা কিছু, নইলে আমি পা জড়িয়ে পড়ে থাকব, কোন মতেই যেতে দোব না, বাবা।"

বাবাজী ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন "গ্রহশান্তিম্—কবচম্—কবচম্।"

আমি বলিলাম, "কবচ হলে তো কথাই নেই। কত খরচ পড়বে বলুন—কিম্ খরচম্?—সবই যখন যেতে বসেছে—"

বাবাজী অমায়িক হাস্যের সহিত হাত নাড়িয়া জানাইলেন— খরচ কিছুই পড়িবে না, শুধু কালি, কলম, আর খানিকটা কাগজ দরকার। সংগ্রহ করিয়া দিলে আমায় সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া দোকানের কড়া আলোকে কবচ-রচনায় বসিয়া গেলেন। আমি সেবার আয়োজনে কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

বেশ পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া বাবাজীর পায়ের কাছে একটি দশ টাকার নোট রাখিয়া বলিলাম, "এই সামান্য পাথেয়, বাবা, ভক্তের নিবেদন···"

বাবাজী খানিকটা ইতস্তত করিয়া নোটটা তুলিয়া লইয়া একটা খাম এবং আরও একটা কিসের ইঙ্গিত করিলেন। আমি শেষেরটা বুঝিতে না পারায় বলিলেন, "গন্দম্—গন্দম্।"

খাম এবং গঁদ আনিয়া দিলে আমায় আর একবার একটু সরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর, আবার মিনিট দু'-এক পরে ডাকিয়া গঁদ দিয়া সাঁটা খামটা হাতে দিয়া বলিলেন, "কল্য মধ্যাহ্নে— একাকী—নতুবা—"

বাকিটা ইশারায় জানাইয়া দিলেন যে এর ব্যতিক্রম হইলে কবচ একেবারেই নিষ্ফল হইবে, তখন আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

পরদিন ঠিক দুপুরে বাড়ির চিলের ছাদে গিয়া খামটা সন্তর্পণে খুলিলাম—কবচ নয়, একখানি চিঠি। সংস্কৃতও নয়, তামিলও নয়, তেলেগুও নয়, খাঁটি বাংলা। লেখা আছে—

"বাপু হে, এ কি ব্যবসা হচ্ছে, না ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান? তিনদিন বসে বসে স্বচক্ষে দেখলাম, কিছু বাইরে থেকেও খোঁজ নিয়েছিলাম, বাকি সব তোমার মুখেই শুনলাম। ব্যবসা করবে তো কায়মনোবাক্যে ব্যবসা কর; যেমন এই আমি করছি, এখন বুঝছ তো? ব্যবসায় গোড়ার কথা হচ্ছে—মানুষের আছে কতকগুলি প্রয়োজন আর কতকগুলি দুর্বলতা; এই দুই রাস্তা দিয়ে

খুব সন্তর্পণে তার টাকার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকে সিন্দুক সাবাড় করতে হবে। এই ব্যবসার শাস্ত্র, এই ব্যবসার স্বধর্ম।—করেছ কি? একেবারে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার! পারবে সামলাতে?—ছিলেন অন্নপূর্ণা, আর ওদিকে ঐ একা শিব। তুমি গেরস্ত বাঙালীর ছেলে, পুঁটি মাছের প্রাণ—ঐ একপাল বুভুক্ষু শিবের ম্যাঁও সামলাতে পারবে? হাড়মাস কালি করে কপ্‌নি সার করে ছেড়ে দেবে একেবারে।

"তোমায় পাঁচ ভূতের পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হতে দেখে মনে বড় কষ্ট হওয়ায় একটু আত্মপ্রকাশ করলাম, নয়তো ব্যবসায় আত্মপ্রকাশ করা অধর্ম। কাল আর আমি এখানে নেই, এ ব্যবসার এই নিয়ম। তুমি সমপেশা অর্থাৎ ব্যবসাদার লোক, উচিত না হলেও বলি—তের দিনে নেহাত মন্দ হল না—এগার জোড়া বস্ত্র, তার মধ্যে একটি গরদের জোড়, টাকা, পয়সা, সিকি, দোয়ানি মিলিয়ে তিপ্পান্নটি টাকা, আরও এটা, ওটা সেটা। মূলধন তো ধুনির ছাই, মিছে কথা, মৌন ভাব আর জবাই-করা সংস্কৃত,—সে-হিসাবে মন্দ কি? ভগবানও কেমন সহায় দেখ,—ভেবেছিলাম যখন 'গন্দম্' বললাম, ধরে ফেলবে।

"যাক্, কবচের ভূমিকা বেশি হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথায় আসা যাক্, অর্থাৎ আসল মন্ত্রে বা মন্ত্রণায়—"

এর পর এক দুই করিয়া সাতটি উপদেশ আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসরণ করিতে হইবে। পরিশেষে লেখা আছে, "নোটটি আর নিতে পারলাম না বাপু। ব্যবসার দিক দিয়ে একটু অধর্ম হল, কিন্তু এটুকু দুর্বলতা আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। ফেরত দিয়ে যাচ্ছি।"

এই গেল ওদিককার ইতিহাস।

আজ মাস দু-এক হইল বাবাজীর (আমি বাবাজীই বলিব) দুই নম্বর উপদেশ অনুযায়ী সদর চৌমাথার দোকান তুলিয়া দিয়া

ভিতরের দিকে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তার উপর নূতন দোকান খুলিয়াছি। পাঁচ নম্বর উপদেশ অনুযায়ী চাল-ডালের অংশটা তুলিয়া দিয়াছি। বাবাজী (আরও গৌরবপূর্ণ আখ্যা দিতে ইচ্ছা করিতেছে) লিখিয়াছেন—ওগুলা নিছক প্রয়োজনের দ্রব্য,—রাখিলেই আবার চক্রবর্তীর দল জুটিবে। কাপড়ের বিভাগটা টেলারিঙে পরিণত করিয়াছি। স্টেশনারি আছে—কাটছাঁট করিয়া, কেবিনটির উন্নতি হইয়াছে। অর্থাৎ এখন রহিল—টেলারিং, স্টেশনারি আর রেস্তরাঁ, মানে মানুষের সিন্দুকে পৌছবার সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা—তাহার দুর্বলতার দিক।

সবচেয়ে বড়—আগাগোড়া আণ্ডারলাইন করা এক নম্বরের উপদেশটা, অর্থাৎ নামকরণ।

আমার নূতন দোকানের নাম হইয়াছে—"বনলতা ভেরাইটি স্টোরস্ এণ্ড রেস্তরাঁ।" বাবাজী নিজেই দিয়া গিয়াছেন।—প্রভু হে কোথায় গেলে ছলনা করিয়া!

সাইনবোর্ডের যেখানটা একটি বৃত্তের মধ্যে সোনার হাতা হাতে অন্নপূর্ণা ছিলেন সেখানে একটি বিরাট তারকার অভ্যন্তরে ফুলের তোড়া হাতে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ সিনেমা-জ্যোতিষ্ক মিস্ বনলতা। তাহার পরেই জ্বলজ্বলে অক্ষরে ঐ নাম—"বনলতা ভেরাইটি স্টোরস্ এণ্ড রেস্তরাঁ।"

বিক্রয়?—নিজের মুখে বলিতে নাই, আলাদীনের প্রদীপও হার মানিয়াছে। এই দুই মাসে প্রায় হাজারখানেক টাকা তুলিয়া লইয়াছি, প্রত্যেক আধলাটি নগদ। চক্রবর্তী-মশাইয়ের বড় নাতি রামদুলাল একাই দিয়াছে দেড়শতটি মুদ্রা,—টেলারিঙে দুইটি স্যুট পাঞ্জাবি আর কামিজে ৬৩৲ টাকা রেস্তরাঁ মারফতে দুই মাসে ৫২৷৷৵১০ আর স্টেশনারি-বিভাগে এসেন্স, সাবান, রুমাল, তেল ইত্যাদি ইত্যাদিতে প্রায় ৩৩৲ টাকা। ছোকরা শৌখীন আর চক্রবর্তী-মশাইয়ের একমাত্র নাতি, তায় নূতন বিবাহ হইয়াছে। এদিকে মনটা দরাজ, রেস্তরাঁতে কখনও একলা প্রবেশ করে না।

বলে, "শৈলদা, কি ফ্যাসাদেই ফেলেছিলে। কতবার ওদিক দিয়ে গেছি, নাকে মোগলাই খানার গন্ধ যাচ্ছে, মনে হয় একবার ঢুকি,—বাব্বাঃ, যা গীতার ধাক্কা!—আর একবারও একটুখানির জন্যে কি খালি করবে জায়গাটা?"

রামদুলাল ছাড়া আরও সব ছোকরার দল; যাঁহারা ওখানে আসিয়া পায়ের ধূলা দিতেন তাঁদেরই বাড়ির ছেলেরা—সবারই অবস্থা যে ভাল তাহা নয়, কিন্তু সবাই সাধ্যমত পয়সা দেয়, কোথা থেকে পায় তাহারাই জানে, কিন্তু পায়। চমৎকার খদ্দের সব, ওদিকে চুরির ভয় না রাখুক এদিকে দেনার ভয় বা লজ্জাটা আছে। বলি—"ভাই তোমাদের ভরসাতেই তো এই দোকানটুকু ফাঁদা, আর তোমরা সব নিজের লোক, জানই তো কি লোকসানটা দিয়ে এসেছি ওদিকে"।—খোশামোদ করি—সুখ আছে খোশামোদ করিয়া; নিজেরা প্রাণ খুলিয়া নগদ মূল্যে খায়, মাখে, পরে; আরও পাঁচটাকে জুটাইয়া আনে। ওদিককার খবরও আনিয়া হাজির করে।—"শুনছ শৈলদা? আসছি, শুনি চক্রবর্তী গোঁসাইকে বলছে—'আরে রামঃ, আবার ওদিকে?—ছেলেটা শেষে এমন অধঃপাতে গেল'!"—

এখন সন্ধ্যার সময় সিনেমা-জ্যোতিষ্কের প্রসন্ন দৃষ্টির নিচে আমার দোকানের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তিনটে বিভাগই গমগম করিতেছে; বসিয়া বসিয়া অলস তামাকের সঙ্গে গীতার কর্মযোগের আলোচনা নয়,—যাওয়া আসা, ফরমাশ, পছন্দ, নগদ মূল্যের ঝনঝনানি! একটা লোকে প্যারে না, প্রত্যেক বিভাগে একাধিক করিয়া লোক, তবু এক সময়ে খদ্দের সামলাইতে হিমশিম খাইয়া যায়। আলাপ-আলোচনাও হয় বইকি,—এ-বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনয়—এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড় রিলীজ, বম্বের রেণুকা দেবী বড় কি কলিকাতার এরা—বনলতাকে নাকি হলিউড টানিতেছে?—সর্বনাশ! তাহা হইলেই তো বাংলা অন্ধকার।—কেবিনে দলের মাঝে বসিয়া রামদুলাল বলে, "বনলতার যে ছবিটা এঁকেছে তোমার

সাইনবোর্ডে শৈলদা হুবহু তার মতন—মার্ভেলাস্! আর ঐ ওর ফেভারিট পোজ্—"

একটু ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর হয়, "কথা বলছিস যেন তোর চাক্ষুষ জানাশোনা!"

রামদুলাল উষ্ম হইয়া ওঠে, টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলে, "আলবত চাক্ষুষ জানাশোনা, তোদের মত হ্যাণ্ডবিলের ছবি দেখে রামদুলাল চক্রবর্তী কখনও একটা ওপিনিয়ন দেয় না। এই রকম একসঙ্গে বসে চা খেয়েছি—বনলতা ওদিকে আমি এদিকে। চায়ে চিনি কম হয়েছে, চামচে ক'রে কাপে চিনি তুলে দিয়েছি—আর কি চাস্?"

একটু চুপচাপ থাকে,—অতি বিস্ময়ের নিস্তব্ধতা; তাহার পর ঈর্ষান্বিত কৌতূহলের প্রশ্ন হয়, "কোনখানে রামদুলুদা?"

"ওদের স্টুডিওতে, আর কোন্খানে?"

আর একজনে একটু সমীহর সহিত বলে, "স্টুডিও ছাড়া বাইরে ওঁদের কারুর সঙ্গে মেলামেশা করবার হুকুম নেই—বড্ড কড়া পাহারা; ঠিক নয় কি রামদুলুদা?"

রামদুলাল বিদ্রূপ-মিশ্রিত হাস্যের সহিত বলে, "হ্যাঁ, মোগল হারেমের বেগম সব!—তবে হ্যাঁ, এ-কথা বলতে পার যে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা না হলে ওরা নিজেই বাইরে বেশি মেশে না কারুর সঙ্গে।—তা ভাই মিছে গুমর করব না, তত বেশি দহরম-মহরম নেই আমার সঙ্গে, অন্তত এখনও হয় নি—"

জমিয়া ওঠে। টেলারিং, স্টেশনারি ডিপার্টমেণ্টের খদ্দেররা ভিড় করিয়া কেবিনে জড় হয়। অনুযোগ হয়, "না, তোমার কেবিন বাড়াও শৈলদা, আরও টেবিল দাও, চেয়ার আন,—কি এক হাত × দেড় হাতের কেবিন করেছ মাইরি!—"

চা, চপ্ কাটলেট, ডিম, পরোটার টান পড়ে, হারানকে আরও দুইজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দিয়াছি, তাহারা থই পায় না, দর্জি-বিভাগ থেকে ছোকরা টানিতে হয়।

বনলতার চিত্রাঙ্কিত হাজার-দেড়েক দেয়াল পঞ্জিকা ছাপাইয়া লইয়াছি, বিলি করি। রামতুলাল ক্যালেণ্ডারটা খুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া বলিয়া ওঠে, "হুবহু!—ওর বিষাদের পোজ্।" তাহার পর বলিয়া ওঠে, "বাই দি বাই, তোমরা সবাই এখন এখানে রয়েছ—আসছে মাসে ওর জন্মদিন, বাইশ বছরে পড়বে। ঠিক করেছি বনলতা-জয়ন্তী করব—ওকে টেনে নিয়ে আসব, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের স্টুডিওর কয়েকজন মাতব্বরকেও। দেখ, রাজী সবাই? একদিনে আমাদের জায়গাটার নাম বেরিয়ে যাবে—চাঁদা দিতে হবে কিন্তু মোটা রকম—"

একটা উল্লসিত অনুমোদন ওঠে। থামিলে রামতুলাল আমার দিকে চাহিয়া বলে, "তোমায় কিন্তু সমস্ত হ্যাপাটি সামলাতে হবে শৈলদা—অতগুলি লোকের খাওয়ান-দাওয়ান—আর সে তোমার গরান্ কাঠের চা আর ইঁদুরের চপে চলবে না বলে দিচ্ছি—আর এক কথা, চাঁদা দিতে হবে, ভাবছ যে লাভের দিকটাই থাকবে, চাঁদার বেলা অষ্টরম্ভা দেখাবে, সেটি হচ্ছে না। ভেবে দেখতে হবে কার নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছ শৈলদা; অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারও তো দেখা আছে আমাদের—"

তা আর অস্বীকার করিতে পারি কি? কৃতজ্ঞচিত্তে বলি, "নিশ্চয় দোব ভাই, তোমরা যা ধার্য করে দেবে। নাম ভাঙিয়ে খাওয়া-না-খাওয়ার কথা নয়!—তোমরা অত বড় একটা ইয়ের জয়ন্তী করছ—আমার দোকানেই—কত বড় একটা সৌভাগ্য এটা আমার!"

আর সকলের বিবৃতি শেষ হইলে শৈলেনের উপর তাগাদা হইল, "এবার এ-বিষয়ে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে বল।"

শৈলেন বলিল, "আমায় বরং ছেড়ে দাও।"

সুধেন প্রশ্ন করিল, "তার কারণ?"

শৈলেন বলিল, "আমি যদি কিছু বলতে যাই, তোমরা তার মধ্যে নিশ্চয় কোন গল্পের প্লট আছে মনে করে বসো। ফলে এমন সন্দেহের সঙ্গে প্রত্যেক কথাটি শোন তোমরা যে, আমি বলে কোন আরামই পাই না। কোথায় ভরা বিশ্বাসে মন দিয়ে শুনবে, না, কেবলই আমার প্লটের ফাঁকি ধরে ফেলবার চেষ্টা। যখন সত্যিই কোন গল্প হাঁকড়াই, তখন এটা সহ্য করা যায়; কিন্তু যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছি, তখনও যদি—"

তারাপদ বলিল, "এতে অভিমানের কিছু নেই, এ তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা লেখকেরা সামান্য অভিজ্ঞতাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সচেতন, অচেতন, অবচেতন নানা রকম জিনিসের দোহাই দিয়ে এমন একটা জিনিসে দাঁড় করাও যে, তোমরা যে কখনও সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।"

সুধেন বলিল, "ও বেচারাদের মুশকিল আছে, সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখলে ওদের পেট চলে না। তোমরা চাও রস, সত্য কথায় তা মোটেই নেই। যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জীবন আগাগোড়া দেখে গেলে মাত্র একটিবার রস বা রসিকতার সন্ধান মিলবে—যখন তিনি 'ইতি গজ' বলেছিলেন। অবশ্য কখনও রসের অপব্যয় করেন নি ব'লে রসিকতাটা একটু মারাত্মক রকম হয়ে জমে উঠেছিল—নাও শৈলেন, এই চমৎকার রাত্রের উপযোগী একটা গল্প ফাঁদ—ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা হয় ভালই, গাল-গল্প হয় আরও ভাল, এই ভূতুড়ে রাত্রির রুদ্ররসে আমরা একটু ডুবে থাকতে চাই।"

সুখেন র‍্যাপারটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল।

শৈলেন বলিল, "নাঃ, মিথ্যেবাদী ব'লে ক্রমেই যে রকম বদনাম হয়ে যাচ্ছে, সত্যিকার অভিজ্ঞতাই একটা বলি।"

সুখেন বলিল, "আমার গা শিউরনো চাই কিন্তু। সেইজন্যে আমি গা আর মন দুটোকেই মুড়ি দিয়ে তোয়ের হয়ে বসেছি।"

শৈলেন বলিল, "যাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় ক'রে সংজ্ঞালোপ ক'রে দিয়েছিল, তাতে তোমার গায়ে একটু কাঁটাও জাগাতে পারবে না, এত বড় বীর তোমায় আমি মনে করি না।"

একটু চুপচাপ গেল ; অলৌকিক গল্পের উপক্রমণিকা হইতেছে মৌনতা। গল্প বলিবার বা শুনিবার আগে লোকে যেন অনুভব করে, সে একটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করিতেছে, চকিত হইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়ায়।

শৈলেন দূর ভবিষ্যতে কোথায় যেন একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

"ব্যাপারটা ঘটে ছোটনাগপুর সাইডে একটা জায়গায়—একটা ডাক-বাংলোয়। জায়গাটার নাম আর খুলে বললাম না। রাঁচী থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো রাস্তা অনেক দিকে চলে গেছে, তারই একটার একটা ডাক-বাংলোর কথা বলছি। আমার তখন তিন বছরের জন্যে বনবাস,—ফরেস্ট রেঞ্জার্সের চাকরি নিয়েছি, একটা জঙ্গলের চার্জ নিতে হবে।

"মোটর বাসে চলেছি। শীতের সময়, বেলা প্রায় চারটের সময়ই দিন মলিন হয়ে এল। দূরে আকাশের কোলে এমুড়ো-ওমুড়ো একটা লম্বা পাহাড়ের রেখা আমাদের মোটর এগুবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ; যেন বিরাটকায় কি-একটা এতক্ষণ

শুয়েছিল, আমাদের এগুতে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে। ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভয়, আগ্রহ, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা কৌতুক বোধ করছিলাম। প্রায় ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের নিচে পৌঁছে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। যখন প্রায় শিখরদেশে পৌঁছেছি, মোটর গেল বিগড়ে। সারতে দেরি হবে, রাত্রি হয়ে যাবে। সান্ধ্য পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে আমি মোটর থেকে নেমে খানিকটা তফাতে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে রয়েছে একটা খাড়া শিখর, সামনে গভীর খাত,—খুব গাঢ় জঙ্গলে ঢাকা বলে আরও গভীর মনে হচ্ছে। প্রথমটা বেশ লাগছিল, কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া যত গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনটার ওপর জেঁকে বসতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ, রহস্যময়। অত বড় একটা বিরাট ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর অসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। কি যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব,—যদি পাহাড়ের ওপর কোন সন্ধ্যা বা রাত্রি না কাটিয়ে থাক তো বুঝতে পারবে না। অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল যে, যে বিরাটকায় জীবটা খানিকটা আগে আমাদের দেখে জেগে উঠেছিল, তারই গর্ভে আস্তে আস্তে জীর্ণ হয়ে চলেছি। এই আতঙ্কের মধ্যে যখন মগ্ন হয়ে রয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে আগুনের ভাঁটার মত প্রকাণ্ড দুটো চোখ জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তলুব্ধ জন্তুর গর্জনের মত এমন একটা উৎকট আওয়াজ চারিদিক কাঁপিয়ে উঠল যে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি সেই পাথরের ওপর থেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—"

সুধেন একটু উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "ভাঁটার মত চোখ নিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল? তোমার কল্পনার অজগর বাস্তব হয়ে পড়ল নাকি?"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, "তখুনি নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা আসলে এই যে—মোটর তোয়ের হয়েছে,

ইলেক্‌ট্রিক হর্ন দিয়ে হেড্‌লাইট জ্বেলেছে, সামনের একটা পাথরের গায়ে তার আলো ঠিকরে পড়েছে।

"হাসি পেল—ভয়ে এমন তন্ময় ক'রে সব ভুলিয়ে দেয়!—এক্ষুনি যে কোন্ অতলে তলিয়ে যেতাম!

"মোটরে এসে উঠলাম। পাহাড়ে পথ দুই চক্ষু দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঘুরে ফিরে মোটর নামতে লাগল।

"কেন জানি না, ঐ যে সন্ধ্যায় কেমন একটা অহেতুক ভয়ের ছাপ মনের ওপর পড়ল—কোনমতেই যেন তা কাটতে চায় না। আমার যে আজকের রাত্রিটা একলা একটা ডাক-বাংলোয় কাটাতে হবে এই চিন্তাটা আমায় পীড়া দিতে লাগল। বরাবরই কেমন যেন অন্যমনস্ক আর মনমরা হয়ে রইলাম। বিপদের ওপর বিপদ, মোটর আর একবার বাগড়া দিলে, আরও প্রায় কোয়ার্টার তিনেক গেল। পাহাড় থেকে যখন নামলাম, তখন দিব্যি রাত হয়ে গেছে। যখন ডাক-বাংলোর সামনে পৌঁছলাম, কব্জি উল্টে হাত-ঘড়িতে দেখি, সাড়ে নটা। শীতের সাড়ে-ন'টাকে গভীর রাত্রিই বলতে হয়, সে নিষুতি আবেষ্টনীর মধ্যে প্রায় দুপুর রাতের সামিল।

"ড্রাইভার কয়েকবার ঘন ঘন হর্ন দিলে। কোন সাড়া নেই। ড্রাইভার বললে, 'মোটর প্রায় ঘণ্টা চারেক লেট হয়ে গেল, কীপার গ্রামে চলে গেছে নিশ্চয়, অবশ্য যাওয়া বেটার উচিত হয় নি। ওর ডিউটি হচ্ছে মোটর দেখে নিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া, কোন লোক না নামলে—'

"খাতির ক'রে আমার বাক্স, বিছানার গাঁটরি আর সুটকেসটা ডাক-বাংলোর বারান্দার এনে রেখে দিলে। বললে, 'আপনার টর্চ রয়েছেই, একটু দূরেই গ্রাম, সেখানে গেলেই তারা কীপারকে ডেকে দেবে। কিন্তু বাবু...' কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

"প্রশ্ন করলাম, 'কি?'

"এই সময় মোটর থেকে তাগাদার হর্ন বেজে উঠল।

"না, কিছু নয়। মানে, এখানকার যে কীপার...'

"আবার তাগাদা হওয়ায় তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে যেতে বললে, —'একলা মানুষ তা ভয় পাবার কিছু নেই এমন।'...কিছু বলতেও পারলাম না ; প্রায় ঘণ্টা তিন চার লেট যাচ্ছে তায় নিজে হতেই একটু খাতির করলে। আর বলবার ছিলই বা কি ? মোটরটা চলে গেল। যতক্ষণ তার একটুও আওয়াজ শোনা গেল, কান পেতে রইলাম, একবার একটা শেষ হর্নের পর একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল,—যেমন দপ করে একবার জ্ব'লে উঠে প্রদীপ নেবে, আওয়াজটাও সেই রকম একটা আর্তনাদ করে যেন নিবে গেল। নির্জন বাড়িটার বারান্দায় আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা চারিদিকে পরিষ্কার, বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টির সীমার বাইরেই নিবিড় অন্ধকার, ডান দিকটায় অন্ধকার যেন আরও এক পোঁছ ঘন, যেটা পেরিয়ে এলাম, সেই পাহাড়টা আর কি।

"বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। টর্চটা জ্বেলে গ্রামের দিকেই যাব ? কিন্তু কোন্ দিকে গ্রাম ? যদি আন্দাজে ঠিক যাই তো হয়তো পাশেই পাব, যদি ভুল দিকে পা বাড়াই তো বোধ হয় এমন দু'চার মাইল গিয়েও মানুষের চিহ্ন পাব না, দেখে তো আসছি সমস্ত দিন, নিতান্ত বিরল-বসতি দেশ।

"রক্ষকটা সম্বন্ধে ড্রাইভার কি বলতে চাইছিল ?—থেমেই বা গেল কেন ?....

"কি করব না করব, কিছুই ঠিক করতে না পেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর কি মনে করে পা বাড়াব, পায়ের পিছনের দিকটায় একটা লম্বা ভিজে টানে আচমকা শিউরে উঠলাম। ফিরে দেখি, একটা খুব বড় কালো কুকুর। তাড়াতে গিয়ে আরও শিউরে উঠলাম হঠাৎ মানুষের আওয়াজ শুনে, কাছেই, বারান্দায় কোণের কাছটায়। কুকুরের খটকাটা সামলাতে না সামলাতেই হঠাৎ এটা কানে যাওয়ায় একটু অভিভূত হয়ে উঠেছি, এমন সময় কুকুরকে শাসাতে শাসাতেই একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে

এল, সামনে এসে সেলাম করে বললে—'ও কিছু বলবে না হুজুর।....মোটর আজ আপনাদের খুব দেরি হয়ে গেল, কিছু দুর্ঘটনা হ'য়েছিল নাকি ?'

"লোকটার খুব বয়েস হয়েছে বলে মনে হল, আর আশ্চর্য রকম রোগা। এত রোগা যে চলছে তা মাটিতে পায়ের আওয়াজটুকুও হচ্ছে না যেন। গায়ে প্রায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া একটা সাদা কম্বল। আঙ্গুলগুলো এত শীর্ণ আর অস্থিসার যে, মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। মোটর ছাড়ার পর থেকে যে একটা কেমন ছমছমে ভাব মনে লেগে ছিল, মানুষ দেখে সেটা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যাওয়া তো দূরের কথা, বরং বেশ একটু বেড়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না; উত্তর দেওয়াই হল না বলা ঠিক। তাকে আড়চোখে একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে বললাম, 'চাবি খোল।'

" 'এই যে খুলি।' বলে আমার আর দোরের মাঝখানটায় আমার দিকে পেছন করে দাঁড়াল আর একটু ঝুঁকে যেন কোমরের চাবিটা তালায় লাগিয়ে দিয়ে তালাটা খুলে ফেললে। দরজা দুটো ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, যান। আমি বাক্স-বিছানা নিয়ে আসছি ভেতরে।'

"তালা খুলল বটে, কিন্তু আমার যেন মনে হল, কোন শব্দ হল না। যা হোক, অতটা গ্রাহ্য না করে আমি বললাম, 'তবেই হয়েছে, তোমায় যেমন সবল দেখছি..."

"লোকটা হি-হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

"আমায় কথাটা বলেই বারান্দায় মোটগুলোর দিকে চলে গিয়েছিল বলে ওর মুখটা দেখতে পেলাম না বটে, তবে হাসির আওয়াজটা কানে একটু নতুন ধরণের ঠেকল। যেন মুক্ত মাঠের ওপর দিয়ে যে একটা কনকনে হাওয়া হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে, তারই একটা ঝলক ঘরের মধ্যে ঢুকে তরঙ্গিত হয়ে আবার কোন্ পথে বেরিয়ে

গেল। হাসি, কিন্তু ঐ হাওয়ার মতোই সুরহীন আর কনকনে, আমার হাড় পর্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

"ভয়ের এত সামনাসামনি কখনও হই নি, কিন্তু নিরুপায় ; আর নিরুপায় বলে জবরদস্তি একটা ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করলাম—না, নিশ্চয় মানুষ। নিজের মনকে ধিক্কার দেওয়ারও চেষ্টা করলাম—দেখ তো, কথা কইলে একঝুড়ি, মোট আনতে গেল, মানুষ নয় ?

"টর্চটা জ্বেলে ঘরে ঢুকে একবার দেখে নিলাম। বেশ বড় ঘরটা, টর্চ ফেলতে আলোটা সামনে একটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতর দিকে আর একটা দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল, অর্থাৎ এই ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর আছে, ছোটই বলে মনে হল। বাক্স-বিছানা আনার কোন শব্দ না পেয়ে ফিরে টর্চ ফেলে দেখতে যাব, দেখি সবগুলি ঠিক পেছনে জড়ো করা রয়েছে।....সুধেন, কি রকম লাগছে?"

ডাক শুনিয়া সুধেন একটু চমকিয়া উঠিল, একেবারে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল আর কি। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "বেশ; এত হাতের কাছে যে ভূতকে পাব, কল্পনাও করতে পারি নি! আর এত স্পষ্ট ভূত যে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন সাহিত্যিক গল্পের অবতারণা কর নি..."

তারাপদ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "হদ্দ একটা গাঁজাখুরি আরম্ভ করেছ। তা সে বরং ভাল! তুমি দুঃখ করছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের সাহিত্যিক গল্পে সর্বদাই একটা যেন ধুকপুকুনি লেগে থাকে। হয়তো যা ভাবছি তা নয়, হয়তো যা হবে মনে করছি ঠিক তার উল্টোটি হয়ে বসবে, হয়তো ঠিক করে রেখেছি এইবার বিয়ে হবে, দু'জনের একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।...নাও, বেশ বিষ্টিটা জমে এসেছে। সেই অত্যন্ত রোগা বুড়োটি নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে সেই অত্যন্ত ভারী মোটমাটগুলো এনে তোমার পেছনে জড় করলে। তারপর ?"

শৈলেন বলিল, "জিনিসটা বোধ হয় গাঁজাখুরির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, যা প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম আর নিজের কানে শুনেছিলাম, মাত্র তাই তোমাদের কাছে বলে যাচ্ছি। একটা কথা আমি গোড়াতেই বলে রেখেছি, লুকোই নি, অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যে থেকেই কেমন একটা থমথমে ভাব আমায় মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—পাহাড়ের ওপরের সেই গম্ভীর স্তম্ভিত ভাব, তারপর সেই জনহীন বাংলোতে সেইভাবে একলা পরিত্যক্ত হওয়া, সেই কালো কুকুরটার নিঃশব্দে এসে পা চেটে দেওয়া, তারপরে আচমকা সেই শীর্ণ লোকটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভাব—সব মিলিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমার আতঙ্কটা পুষ্ট করে যাচ্ছিল। ওরই মধ্যে আবার লোকটাকে পেয়ে এক-আধ বার একটু সাহসের মত হয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু সে ভাবটা স্থায়ী হতে পেল না। হয়তো জিনিসগুলো আনতে, রাখতে শব্দ হয়েছিল। প্রেত ইথারজাতীয় বটে; কিন্তু সে যা স্পর্শ করবে তাও যে লঘু হয়ে যাবে, এমন কথা আমি কোথাও পাই নি। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুনই হোক বা যে জন্যেই হোক, ঘুরে জিনিসগুলোর ওপর নজর পড়তেই মনে হল, কই, শব্দ শুনলাম না তো।

"একটা কথা বলি নি, লোকটা—আমি 'লোকটা' বলেই চালাই—কোনও আলো সঙ্গে আনে নি।

"তিন চারটে জিনিস এল—দিব্যি ওজনদুরস্ত, অথচ একটু শব্দ কানে এল না, আর এসে পড়লও যেন ফিরে না দেখতেই,—একটা বিশ্রী খট্‌কা লাগল। কি বলতে চেয়েছিল লোকটার সম্বন্ধে?—এই নয়তো যে সে নিজে দূরে থাকার দরুন সব সময় আসতে পারে না, আর...

সেই ফাঁকতালে চিন্তার মাঝখানেই সমস্ত শরীরটা আমার শিউরে উঠল। আবার তখনই সে ভাবটা কেটে গেল, কেননা কড়া টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখছি একটা মানুষ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে; এই শুনলাম কথা কইলে,—স্বরটা হয়তো একটু চাপা,

কিন্তু নাকী নয় ; এ অবস্থায় সন্দেহও আবার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনটাকে আবার ধাতস্থ করে নিলাম। বললাম, 'বিছানাটা পেতে ফেল দিকিন।...আচ্ছা, আগে আলোটা জ্বেলে ফেল। কোথায় আলোটা? টর্চ আর কতক্ষণ জ্বেলে রাখব? জ্বেলে রাখা মানেই তো পয়সা পোড়ানো।' আলাপটা সহজ করে ফেলবার জন্যে এইটুকু রসিকতাও করেছিলাম। লোকটা সেই রকম হি-হি করে হেসে উঠল, বললে, 'না, টর্চ আর আপনাকে বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখতে হবে না বাবু—হি-হি-হি-হি...'

"প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মজা হল, টর্চের চাবিটা টিপে ধরে টর্চটা জ্বেলে রেখেছিলাম, আঙুলটা একটু আলগা হয়ে গিয়ে টর্চটা নিবে গেল। আলগাভাবে ধরে রাখলে স্প্রিং-ওলা টর্চগুলো হয়ই এ রকম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর জ্বলল না, ফিউজ হয়ে গেল।

"বললাম, 'টর্চটা যে খারাপ হয়ে গেল।'

"অত কড়া একটা আলো নেবায় আরও অন্ধকার হয়ে গেছে, কাউকে দেখতেও পেলাম না, কোন উত্তরও পেলাম না।

"টর্চটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে যাওয়াটা খেয়ালের মধ্যে আনি নি, ওরকম কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু উত্তর না পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত দুয়েকের মধ্যে এই লোকটা ছিল, অথচ উত্তর নেই কেন? একবার মনে হল হাতটা চালিয়ে দেখি—ঠেকে কিনা কারুর গায়ে ; কিন্তু কেন বলতে পারি না, সাহস হল না ও পরীক্ষা করতে। নিজের গলার আওয়াজে নিজের ভয়টা ভাঙবার জন্যে একটু জোর আওয়াজে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় গেলে?'

"উত্তর নেই। শুধু হাওয়ার শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

"বুঝতে পারছি, শরীরটা ঝিমঝিম করে আসছে। মরিয়া হয়ে আরও জোরে বললাম, 'গেলে কোথায়? তোমায় যে আলো আনতে বললাম! শুনছ, গেলে....'

"হঠাৎ থেমে যেতে হল, আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে ঘরটা এমন বোঝাই হয়ে গেল যে, মনে হল, অন্ধকার ঘরটায় কাদের

মেলা বসে গেছে। আমার ভয়ে-অতি-সজাগ কানে শোনাল যেন ঘরের চারিদিকে শতকণ্ঠে কারা আমারই কথার ব্যঙ্গ প্রতিধ্বনি করে বলছে, 'গেলে কোথায় ?...তোমায় যে আলো আনতে বললাম !.... শুনছ ?"

"অনুভব করছি, মাথার চুলগুলো যেন কদমফুলের মত খাড়া হয়ে উঠেছে। কি যে করব, বুঝতে না পেরে অসাড় হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর পাশে নজর পড়তে মনে পড়ল, দরজাটা খোলা আছে। একটা চিৎকার করে ছুটে বেরুতে যাব, দেখি সামনের দেয়ালে একটি অস্পষ্ট আলো পড়ল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ঠন হাতে পাশের ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। পাশে জমাট-বাঁধা এক খাবলা অন্ধকারের মত সেই কুকুরটা। ময়লা চিমনি, তেলটা খারাপ নিশ্চয়, খানিকটা ধোঁয়ার নিচে একটা মিটমিটে শিখা জ্বলছে। গাছের শেকড় যেমন মাটি আঁকড়ে থাকে, সেই রকম ভাবে লিকলিকে কালো কালো আঙুল দিয়ে লোকটা লণ্ঠনের হাতলটা লেপটে ধরেছে। অস্পষ্ট আলো তার কোটরগত চোখে, উঁচু চোয়ালের হাড়ের ওপর পড়ে উৎকট দেখাচ্ছে।...কিন্তু তা দেখাক্, রোগা মানুষ, উপায় কি ? যা হোক ভূত তো নয়, ভূতে তো আর আলো জ্বেলে আনবে না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'তাই বলি, তুমি বুঝি আলো জ্বালতে গিয়েছিলে ?'

"হ্যাঁ, আলোটা জ্বেলে নিয়ে এলাম। এবার আপনার বিছানাটা ক'রে দিই। খাবেন কি ?'

"বললাম, 'সেজন্যে ভাবনা নেই। টিফিন-কেরিয়ারে আমার খাবার আছে, তুমি শুধু বিছানাটা করে দাও।'

"'কই, আপনার টিফিন-কেরিয়ার তো দেখলাম না !'

"সে কি !—ব'লে ফিরে মোটগুলো দেখতেই চক্ষুস্থির। টিফিন-কেরিয়ারটা সত্যিই নেই ! বিমূঢ়ভাবে একটু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। সরালে নাকি খাবারসুদ্ধ কেরিয়ারটা ?

"বললাম, 'বারান্দা থেকে আন নি বোধ হয়। দাঁড়াও তো দেখি।'

"আলোটা নিয়ে বারান্দায় এলাম, সেখানেও নেই কেরিয়ারটা। লোকটা মোটগুলো ভেতরে নিয়ে আসবার সময় লুকিয়ে ফেলে নি তো? কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। আমি যতদূর বুঝলাম, ও বাইরে থেকে যেটুকু সময়ের মধ্যে জিনিস তিনটে এনেছে, তাতে একটা জিনিসই আনা চলে না, এর মধ্যে আর লুকোবার সময় পাবে কোথা থেকে? তবুও কেমন একটা জিদ ধরে গেল, সেই কালি-পড়া আলো নিয়ে সমস্ত বারান্দাটা এমুড়ে-ওমুড়ো একবার দেখে নিলাম। না পাওয়াতে আরও রোখ চেপে গেল—নিশ্চয় কোথাও রেখেছে। বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পেছনে গেলাম। একহারা বাংলো, মাঝখানে একটা বড় ঘর দু'দিকে দুটো ছোট ছোট ঘর; সামনের দিকে বারান্দা আছে, পেছন দিকে তাও নেই। বাড়িটার পরেই পরিষ্কার জমি। কোথায় লুকোবে? অথচ টিফিন-কেরিয়ার আমি এনেছি। বাসে একবার পড়ে গিয়ে বাটিগুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল, গুছিয়ে ভাল করে বসিয়ে দিলাম। তবে? চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দূরে নজর পড়ায় মনে হল, খানিকটা দূরে—কম্পাউণ্ডের শেষে একটা ঘরের মতো আছে। চোর যেন ধরে ফেলেছি এই রকম উৎসাহ নিয়ে এগুলাম। একটা ছোট্ট ঘরই, শেকল দেওয়া। ঢুকে ভেতরে গিয়ে দেখি, একটা কেরোসিন তেলের আধভরা টিন গোটা দুই আলো গোটা দুই বালতি; টিফিন-কেরিয়ার নেই। রাগ, কি জিদ, কি নিরাশা, কি ঘরে ফিরে আবার সেই লোকটাকে দেখতে পাওয়ার ভয়—ঠিক বলতে পারি না, তবে এটা বেশ মনে আছে যে, নিশিতে পাওয়ার মত আমি ক্রমাগতই সেই মিটমিটে লণ্ঠনটা হাতে করে বাড়িটার চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলেছি দু'বার, চারবার, পাঁচবার, তারপর আর হিসেব নেই; ঘুরেই চলেছি, মনে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন—আমার খাবার কোথায় গেল? কেরিয়ারের মধ্যে ক'রে আনা আমার খাবার? কোথায় গেল আমার খাবার? ভেতরে ভেতরে কার সঙ্গে যেন একটা তুমুল তর্ক বেধে গেছে—বাঃ, গেলেই হল খাবার?—অত কষ্ট করে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম!

"মাটির দিকে চেয়ে খুব একমনে খুঁজছিলাম। হঠাৎ একবার চোখ তুলতে প্রায় এক রকম আঁতকে উঠলাম, পাহাড়টা যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রথম তাড়সটা কেটে গেলে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি,—পাহাড়ের ঠিক মাথায় সবে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় পাহাড়ের ওপরের রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় মনে হচ্ছে, পাহাড়টা যেন খুব কাছে। কিন্তু অন্যমনস্ক হওয়ায় একটা ফল হল নিজে যে কোথায় রয়েছি জ্ঞান হল। দেখি আলোটাতে আর কিছু নেই, গাঢ় কালির মধ্য দিয়ে একটা ক্ষীণ রাঙা টকটকে শিখা কোন রকমে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ গাটা শিউরে উঠল, হাতে হাত দিয়ে দেখি একেবারে হিম হয়ে গেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঘড়িটাতে দেখি প্রায় একটা, অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুরেছি এই ছটাকখানেক বাড়িটার চারিদিকে।—ঘুরে ঘুরে আবার খুঁজেছি!

শৈলেন একটু চুপ করিয়া সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল!

তারাপদ বলিল, "বৃষ্টি দেখছি আজ আর থামবে না।"

সুধেন কহিল, "তোমায় বাহাদুরি দোব, জ্ঞানটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লে না! প্রায় সেই রকমই হয়, লোকে ভয়ের মধ্যে অনেক সময় ঠিক থাকে, কিন্তু ভয়ের ঝোঁকটা কেটে গেলে যখন দেখে কি অবস্থার মধ্যে ছিল, তখন অনেক সময় আর টাল রাখতে পারে না। অনেক সময় মারা পর্যন্ত যায়।"

শৈলেন ধীরে ধীরে যেন আবিষ্টভাবে বলিল, "অজ্ঞান তখনও হই নি, তবে কেন যে হই নি, আমার এখনও আশ্চর্য বোধ হয়। ফিরে এসে দেখি, লোকটা বারান্দায় একটা যেন কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হল রাগ, বললাম, 'আমি ঘণ্টা তিনেক—।' কি ভেবে কথাটা আর শেষ করলাম না, লোকটা দু'হাতে চোখ রগড়ে, ঘড়ঘড়ে, অথচ অত্যন্ত চাপা স্বরে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবু, ঘুমকাতুরে মানুষ—পেলেন না?'

বললাম, 'না'।

'বাসে এনেছিলেন ঠিক মনে আছে ?'

"আমার রাগটা আরও বেড়ে গেল ; হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিতে যাব, তখুনি সম্বিৎ হল—যদি হাত ধরতে গিয়ে শূন্যে মুঠো বাঁধি ! কিংবা যদি দেখি, শুধু একটা মড়ার হাড় মুঠিয়ে ধরেছি ! এখন তবুও তো মাঝখানে একটা সন্দেহের ব্যবধান আছে, তখন ? নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয় এনেছিলাম।'

"বললে, 'আচ্ছা, আপনি ভেতরে যান, নিশ্চয় খুব শীত করছে আপনার'।"

"আমার ভুল বোধ হয়, কিন্তু মনে হল যেন ঘরে ঢুকে কপাট দুটো ভেজিয়ে সেই অন্ধকারে আলোর শিষটা উসকে দিয়েছি, এই-টুকুর মধ্যেই লোকটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। টিফিন-কেরিয়ারটি সামনে রেখে দিয়ে বললে, 'এই নিন, হি-হি-হি-হি...'

"সেদিন আমি মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতির পরিচয় পাই, ভয়ের চরম অবস্থায় আর ভয় থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, এটা বড় ভীষণ অবস্থা, এর একচুল পরেই উন্মাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ; এটা ঠিক বর্ডারল্যাণ্ড। আর সন্দেহ নেই ; বেশ বুঝতে পারছি, হাতখানেক দূরেই প্রেতাত্মা ; তারই সঙ্গে কথা কইছি, বেশ স্পষ্ট দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় পেলে ?'

"হি-হি-হি করে হাসির সঙ্গে উত্তর হল, 'আপনি যেখানে রেখেছিলেন।'

"প্রতি মুহূর্তেই উৎকট ভয়ের এক একটা ঢেউ যেন সমস্ত শরীর তোলপাড় করে ভেঙে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই মরিয়া হয়ে রুক্ষ হয়ে উঠেছি ; কেমন যেন একটা নেশা চেপে গেছে —যা স্পষ্ট নগ্ন সত্য, তার সম্মুখীন হতে হবে। একটু রূঢ় স্বরেই বললাম, রেখেছিলাম মোটর বাসে, সেটা এখন কিছু নয়তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে আনতে হলে..."

"শেষ করতে পারলাম না ; নিজের কথাতেই যেন একটা অদ্ভুত

ভয়ে শরীরটা ভেতর থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে !! পঁচিশ-ত্রিশ মাইল !!!…

"এর পর এইটুকু মনে পড়ে যে, হি-হি-হি-হি করে একটা হাসি ক্ষীণ হতে হতে একেবারে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল। আর অল্প একটু মনে পড়ে, বরফের মত একটা ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শের অনুভূতি।"

শৈলেন চুপ করিল, মনে হইল, কাহিনীটা বলিতে সে যেন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে তাহার সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিল। এবার বেশ ঘরোয়া কথাবার্তার মত বলিতে লাগিল, "মাঝে অল্প জ্ঞান হয়েছিল কি না মনে নেই ; তবে একটু ভাল করে যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়েছে, দেখি আমার চারিদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, আমি একটা বড় ঘরে একটা খাটের ওপর শুয়ে আছি। একজন লোক মাথায়, একজন পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

"পায়ের কাছের লোকটির ওপর চোখ পড়তেই চোখ আর ফেরাতে পারি না। লোকটি হি-হি-হি করে হেসে বললে, 'কিছু ভয় নেই বাবু, রাতে অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন ? আমি না ধরে ফেললে তো পড়েই যেতেন মুখ থুবড়ে।'

"ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর হুঁশ হল,—সত্যিই তো, না হয় বেয়াড়া রকম রোগাই, কিন্তু এ-মানুষকে অত ভয় পাবার—"

তারাপদ ও সুধেন বিস্ময় আর নিরাশায় এক রকম চিৎকার করিয়াই উঠিল, "মানুষ !"

শৈলেনও ঈজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "তবে তোমরা কি ভেবেছ ? রোগা আর খাপছাড়া মানুষ মানুষই নয় ?"

দু'জনেই কতকটা অপ্রস্তুতভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শৈলেনের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধেন বলিল, "আবার ঠকালে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর রং ফলিয়ে গল্প !"

শৈলেন বলিল, "তোমরা যে রস চেয়েছিলে সেটা পেয়েছ তো ? ডাক-বাংলোর কীপারেই যদি তা পরিবেশন করতে সক্ষম তো আপত্তি কিসের ?"

তারাপদ বলিল, "বেশ, গল্পই যদি, সমালোচনার ধাক্কা সামলাও —মানুষ পঁচিশ মাইল দূরে বাসের ভেতর থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এল কি করে ? আর সবই নয় বাদ দিলাম—তোমার মনটা সেদিন ভয়ে খুব high-strung ছিল, সবই তার বিকার।"

শৈলেন ক্রমেই বেশি আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আনেনি তো অত দূর থেকে !"

"তবে ?"

শৈলেন উত্তর করিল, "সে কথা তো ও লোকটা নিজেই বলে দিলে আমি যেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।"

"কোথায় রেখেছিলে ?"

"মোটর থেকে নামিয়ে রাস্তায়।"

তারাপদ, সুধেন শৈলেনের মুখ থেকে দৃষ্টি নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। শৈলেনের মত অবস্থায় না পড়িয়াও যে তাহার মত ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার জন্য বোধ হয় লজ্জিত হইল একটু।

জামাইষষ্ঠী

হঠাৎ বিজলিবাতি নিভিয়া গিয়া গাড়িটা অন্ধকার হইয়া গেল।

এ লাইনে এরকম হইয়াই থাকে। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া, বইখানি খুলিয়া নিশ্চিন্তমনে পড়িতে বসিলে—দপ করিয়া আলোটা নিভিয়া গেল। 'দুত্তোর' বলিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলে, তেমনি হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! এ একরকম ফ্যাসাদ আর কি! রেলবিভাগের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; বেহারী হইলে হাতটা চিতাইয়া নির্লিপ্তভাবে বলে, "জানে হনুমানজি," বাঙালী হইলে উল্টাইয়া প্রশ্ন করে, "এ লাইনের কোন্ জিনিসটা ঠিক চালে চলতে দেখেছেন মশায়?"

কোনটাই ঠিক ভাবে চলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

প্যাসেঞ্জাররা নির্বিকার, নির্বিকল্প। থার্ডক্লাসে বসিলে প্রায় শোনা যায়, কঙ্কর সাজিতে সাজিতে কিংবা খৈনিতে তালি দিতে দিতে এখানকার অননুকরণীয় গ্রাম্য হিন্দীতে কেহ বলিতেছে, "আসমানকে বিজলি বান্‌ু?"...ইত্যাদি, অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ—ও তো এমনি দপ করিয়া নিভিবেই, দপ করিয়া জ্বলিবেই,—এ আর কি নতুনটা দেখিলে সবাই!

তড়িৎ-বিজ্ঞানের এমন বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতার দল তুষ্ট হইয়া বলে, "ওয়াজিব—ওয়াজিব" অর্থাৎ—হ্যাঁ, ঠিকই তো…।

দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা। নৃপেন বলিতেছিল, "সো গ্ল্যাড! তারপর, খবর কি? শুনেছিলাম কার মুখে যেন যে এই কলেজেই ভর্তি হয়েছিস। কাছেই থাকি, কিন্তু একবার এসে যে—"

এই সময় আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। ওদিকে গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল ; লাঠি পাগড়ি সমেত এক দল এদেশী লোক সাঙ্গোপাঙ্গদের হাঁক দিতে দিতে, এবং তারই মধ্যে দু'একজন তারস্বরে মকাইয়ের বাজারদর আলোচনা করিতে করিতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই—"ই ডেওঢ়া বা হো!" বলিয়া জটলা বাঁধিয়া নামিয়া গেল। খানায় আটকান বন্যার জলের মতো মাত্র দুটি লোক অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

নৃপেন বলিল, "বিলকুল রেহাই দিলে না,—গেল দু'টোকে ছেড়ে!"

ইণ্টার ক্লাসের গাড়িটা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মে আলো নাই, তায় আকাশে মেঘ, তবু আন্দাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেবেশ বলিল, "না, এরা ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে, ভেড়ার দল সবই নেমে গেছে।"

কামরায় তিনটি বেঞ্চ। একটিতে গদি নাই, একটিতে একখানি বিশাল বপু কপট নিদ্রায় সতর্কভাবে নাক ডাকাইতেছে। আগন্তুক দু'টি অন্ধকারে একটু এদিক-ওদিক করিয়া দেবেশের বেঞ্চির এক কোণেই বসিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, "সে যাই হোক্, যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি, ছাড়ছি নে। আমার বাড়ি তিনটি স্টেশন পরেই, নেমে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। ভালোকথা,—যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় তাওতো জিগ্যেস করি নি। পেটে এত কথা হুড়োহুড়ি করছে যে, কোন্‌টে রেখে কোন্‌টে যে জিগ্যেস করব..."

দেবেশ বলিল, "ভাই, যেখানে যাচ্ছি তা যদি তোমায় জানাই তো ভয় হয় নেমন্তন্ন কেটে উল্টে সঙ্গ না নিয়ে বস।"

"কি রকম, কি রকম?"

"যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, পুশারোড স্টেশনে ; তোমার আগেই নেমে যাব। আশা আছে নিজে অনভিজ্ঞ হলেও..."

'শ্বশুরবাড়ি!'—বলিয়া নৃপেন বিস্ময়ে একরকম চিৎকার করিয়াই উঠিল। "বিয়ে করলে কবে? কৈ, ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি!"

"ঠাকুরমার অসুখের কল্যাণে ব্যাপারটা একেবারে হঠাৎ হয়ে গেল। তবু অপরাধ স্বীকার করছি ; দণ্ডাদেশ কর।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক আছে বটে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় বেহারী, তাহার উপর অন্ধকারে তাঁহাদের মুখ দেখা না যাওয়ায় চক্ষুলজ্জার বালাই নাই। বিশ্রম্ভালাপ খুব জমিয়া উঠিল। বাধামুক্ত গলা গাড়ির আওয়াজেরও দুই পর্দা উপর দিয়া চলিল—শ্বশুরবাড়ির কথায় হৃদয়ের দুয়ার একেবারে হাট আদুড় করিয়া দেয় কিনা !

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "কি সাজা দোব ? তোমার কাছে এখন রাজার রাজ্যও তো অকিঞ্চিৎকর।" একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ দিচ্ছি দণ্ড—এক একটি মুহূর্ত এখন তোমার কাছে অমূল্য, তাই থেকেই তোমায় মোটা রকম কিছু বঞ্চিত করলাম,—অর্থাৎ আমার ওখানেই তোমার আপাতত যেতে হচ্ছে"—বলিয়া আরও জোরে হাসিয়া উঠিল।

দেবেশ জানালার পাতলা আলোর সামনে হাতজোড় করিয়া বলিল, "এই তো হল দণ্ড ? এখন আমার স্বপক্ষে একটু আপীল করতে চাই, ভরসা আছে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় নিজে মর্মজ্ঞ না হলেও যুক্তির সারবত্তা দেখে তাঁর কঠিন মন টলবে। তাহ'লে ধর্মাবতার, প্রণিধান করিতে আজ্ঞা হোক।—এই সামান্য দোষে এক মুহূর্তের জন্যও শ্বশুরবাড়ি থেকে বঞ্চিত করা লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে পড়ে, কেননা, ধরার তাপদগ্ধ মানবের একমাত্র চরম সান্ত্বনা এই শ্বশুরবাড়ি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ব'লে গেছেন—ভ্রমর জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত। সব গোবিন্দলালের আপন আপন ভ্রমর সম্বন্ধে এ কথাটা সমান ভাবে খাটলেও, তাঁদের নিজের নিজের পিতৃগৃহে সব ভ্রমরই আর অনেকানেকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত খেলো, কেননা তাঁদের চেয়েও এমন সব মধুরতর মধুরতম জীব সেখানে বিহার করেন যাঁদের মহিমা বর্ণনায় ভাষাও মৌন হয়ে পড়ে। সেখানে থাকেন শালী—তিনি ধরায়

স্বর্গ, স্বর্গে অপ্সরা, অপ্সরায় উর্বশী ; সেখানে থাকেন শালাজ—তিনি আবার শালীর চেয়েও শক্তিশালী। ধরার আদেখলো জীব আমরা, হদ্দ স্বর্গ আর উর্বশী পর্যন্ত কায়ক্লেশে ধারণা করতে পারি, সুতরাং এঁদের বর্ণনার চেষ্টা করে কল্পনাশক্তিকে আর অপদস্থ করব না।

"শ্বশুরবাড়ির মর্ম যে শুধু আমরাই বুঝেছি তা নয় ; দেবতারাও বাদ যান না। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করলে তিনটি বড় বড়তে এসে ঠেকেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা আগে কি রকম ছিলেন বলা যায় না, তবে বার্ধক্যে এসে পিতামহ হওয়া পর্যন্ত চরাচরে শ্বশুরবাড়ি সৃষ্টি করা নিয়ে মেতে আছেন। বাকি রইলেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর ; এঁদের শ্বশুরবাড়ি-প্রীতি ব্যাখ্যান করে কবি কি মন্তব্য দিচ্ছেন ধর্মাবতারের শুনতে আজ্ঞা হোক—

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরি শেতে পয়োনিধৌ
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।

"হর, অর্থাৎ মহেশ্বরের শ্বশুরবাড়ি হল হিমালয়ে, তিনি সারা জীবনটা সেইখানেই কাটিয়ে দিলেন। হরির, কিনা বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়ি হল পয়োনিধি অর্থাৎ সমুদ্র, কেন না বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মীর উদ্ভব সেই-খানেই, তাই তিনি সেইখানেই শয়ন করে কাটালেন। এই সব দেখে শুনে কবি বলছেন, এই অসার সংসারে 'শ্বশুর-মন্দিরম্'ই হচ্ছে সার বস্তু। সুতরাং ধর্মাবতার যদি অধমকে এ-হেন শ্বশুর-মন্দির থেকে বঞ্চিত করেন তো…"

পাশের ভদ্রলোকটি বেশ একটু জোরে গলা-খাঁখারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দেবেশ নৃপেনের গা-টা টিপিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "বোধ হয় বাংলা বোঝেরে।"

কথাগুলো নৃপেনের লাগিতেছিল ভাল এবং ক্রমে খোদ বন্ধুপত্নীর সরসতর প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলিবার বাগ খুঁজিতেছিল। আস্তে বলিল, "বোঝে তো মাথা কেটে নেবে, হ্যাঃ।" তাহার পর জোরেই বলিল, "এ যুক্তির ওপর তোমায় মার্জনা করা যায় না ; বৈষ্ণবিক ভাষায় বলতে গেলে এহ বাহ্য,আরও কিছু থাকে তো বল।"

পাশের সহযাত্রীটির গলার আওয়াজে যে একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িতেছিল তাহা আর জমিতে পারিল না। তা' ভিন্ন শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছার চেয়ে বক্তার বলিবার ইচ্ছা কম বলবতী ছিল না। দেবেশ বলিয়া চলিল, "একে তো এ-হেন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, তাতে আবার যাত্রার উপলক্ষটা গুরুতর—কাল জামাইষষ্ঠী। এই দিনটার দিকে সাধারণ জামাতা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও সারাটি বছর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, যদি বঞ্চিত হই তো আয়ুক্ষয় হবে, আবার একটা বছর বেঁচে থাকবার উৎসাহ হারাব। তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ভগবান প্রজাপতি এই দিনটি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে আমাদের জন্য আলাদা করে দিয়েছেন। এদেশটা নীরস! এই গাড়ি যদি বাঙলাদেশের গাড়ি হত তো আদমসুমারী করলে দেখা যেত, এর শতকরা নব্বই জন জামাই। হরেক রকমের জামাই—সিদে জামাই, কুঁজো জামাই, ঢেঙা জামাই, বেঁটে জামাই, মাকুন্দো আর গুঁপো জামাই, আনকোরা, দোজবরে জামাই—মোটকথা যতরকমের জামাই আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে। বাকি দশজন হচ্ছেন শ্বশুর কিংবা সম্বন্ধী জাতীয়—শহর থেকে জামাইষষ্ঠীর বাজার ক'রে ফিরছেন! আহা চিন্তায়ও সুখ,—বাড়িতে কিংবা হস্টেলে যাকে দিনান্তেও কেউ একবারও ফিরেও দেখে না, আছি কি গেছি—সেই নগণ্য হাবার জন্যে শাশুড়ী এতক্ষণ বোধ হয় চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় তোয়ের করতে ঘর্মাক্ত; শালীমহল সুমিষ্ট প্রবঞ্চনার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত। ছোট শহর, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায় না, শ্বশুরমশাই আজ সারাটা দিন বোধ হয় রোদবৃষ্টি মাথায় করে আমারই রসনা-তৃপ্তির জন্যে সারা মজঃফরপুর ঘেঁটে বেড়িয়েছেন—কে জানে বোধ হয় এই গাড়িতেই কোথাও বসে হৃষ্টচিত্তে ভাবছেন—যাক্, দিব্যি আমগুলো পাওয়া গেছে, দেবেশ আমার ল্যাংড়া যেমন ভালবাসে। সে বেচারির এইতেই ফুর্তি; দেবেশ ভালবাসে এইতেই তিনি কৃতার্থ—হাত্তোর বোকারাম রে!

"এই জন্যেই তো গিন্নীকে শাসিয়ে রেখেছি—দেখ, যদি মেয়ে

হয় তো তোমায় ডাইভোর্স করব কিন্তু। আমি করব উপার্জন, তার ওপর আবার বাজার করতে পায়ে ঘাঁটি পড়াব, আর সে ব্যাটা জামাই—নবাব খাঞ্জা খাঁ আমার, দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে...”

শেষ হইবার পূর্বেই দু'জনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পাশের লোক দুটিও অর্ধস্ফুট হাসিতে কাঁপিতে লাগিল। মুখ দেখা না গেলেও দেবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, “আপলোক বাঙলা সমঝতেহেঁ মালুম পড়তা ; ঠিক হ্যায় কি নেহি কহিয়ে না—হাম মরে কামা করকে, আওর...মেরা দামাদ...”

নৃপেন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “আর যদি জামাই হয়ই তোমার দুর্ভাগ্যবশত ?”

দেবেশ বলিল “তা'হলে আমার চেয়ে তাঁরই দুর্ভাগ্য বেশি ! বাবাজী যেমনি পাঞ্জাবি দুলিয়ে, কোঁচা লুটুতে লুটুতে জামাইমার্কা মৃদু হাস্য করতে করতে লটবর চালে গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রণাম করবেন, অমনি গলাটি টিপে ধরে রাস্তার দিকে মুখটি ফিরিয়ে দিয়ে বলব, যাও, সিদে উল্টোমুখে ; মেয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে, আবার এখানে কি মনে করে সোনার চাঁদ...?”

হাসি চলিতে লাগিল। পাশে দুইটি অপরিচিত লোক—এই চিন্তায় যা বা একটু সংকোচ ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই কাটিয়া গেল। ক্রমশ এ-দুজনের চক্ষে তাহারা রসিক ও সমঝদার হিসাবে যেন দলভুক্তই হইয়া পড়িল। অন্ধকারে বয়সও ভাল বোঝা যায় না, এবং সেইজন্যই সমবয়সী বা কাছাকাছি ঐরকম বলিয়া ধরিয়া লইতেও আটকাইল না। দেবেশ মাঝে মাঝে তাহাদের সাক্ষী মানিতে লাগিল, “ঠিক হ্যায় কি নেহি, সাহেব,—কহিয়ে—”

অন্ধকার ভেদ করিয়া এবং নিবিড়তর অন্ধকার গর্ভে পুঞ্জীভূত করিয়া গাড়ি ঠায় চলিয়াছে। এই রহস্যময় আবেষ্টনীকে নব্য জামাতার কৌতুকময় শ্বশুরালয়-রহস্য বেশ একটি অদ্ভুত রসে আর্দ্র করিয়া তুলিল।

নৃপেন বলিল, "আপীলের যুক্তি খুব সারবান বটে! এইরকম একজন ভাবী শ্বশুরকে তার নিজের শ্বশুর-মন্দিরে যেতে দেওয়া তবেই চলে, যদি তার নিজের শ্বশুর সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য লগুড়-হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী হন। তা' তোমার শ্বশুরের মতামত যখন এখানে পাচ্ছি না..."

কণ্ঠস্বরে ভয়ের অভিনয় করিয়া দেবেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, ধর্মাবতার, মাফ করা হোক, ওটা সাক্ষীর temporary insanity, সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকার—আপনার মূল দণ্ডের আদেশ শুনে অবধি তার মাথার ঠিক নেই কিনা...আর একটা কথা তোমায় আগে বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই,—প্রফেসার গুপ্টার কল্যাণে তোমার দণ্ড আমি আগে থাকতেই ভোগ করে বসে আছি, আর বল কেন; না হলে বেলা দেড়টার গাড়িতে কোথায় আলোয় আলোয় আলো করে যাব, না, অন্ধকার রাত্রে এই যমালয়যাত্রার দুর্ভোগ! লোকটা দিলে না ছুটি কোন মতে হে!"

নৃপেন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ওটার কথা আর বল না; একটা বেরসিক ভূত...শ্বশুরবাড়ির নামে অত খেপচুরিয়াস্ কেন রে বাপু! নিজে বিয়ে করলিনি করলিনি, কপালে নেই; তা ব'লে..."

বাধা দিয়া দেবেশ বলিল, "বিয়ে করলে না! তুমি তাহলে লেটেস্ট দাম্পত্য-বুলেটিন্ অবগত নও দেখছি;—আরে গুপ্টা সাহেব যে মুড়িয়েছেন মাথা শেষ পর্যন্ত, তুমি আছ কোথায়? আর দুর্ভাগ্যক্রমে পুশাই হয়েছে তার প্রয়াগ-ক্ষেত্র; তাই তো নেহাত শিষ্য-সমভিব্যাহারে যেতে হবে বলে..."

"থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসার গুপ্টা—হুর্‌রে!" অন্ধকারেই হস্তটা তুলিয়া নৃপেন চিৎকার করিয়া উঠিল।

ও বেঞ্চের স্থূলকায় লোকটি সশব্দ কপট-নিদ্রার মধ্য দিয়া কখন অনাড়ম্বর অকপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; হুড়মুড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে জিত্তে-ও?" সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবেশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় মাড়োয়ারী, আজ কলেজ-টাউন ক্লাব ম্যাচে কিছু টাকা ধরে থাকবে...নাও, আর থ্রি চিয়ার্স কাজ নেই, বেজায় চটেছি লোকটার ওপর। ওর সাবজেক্টে পার্সেণ্টেজটা কম আছে, ভাবলাম, কাজ কি—হাজরিটা একটু দিয়েই সোজা ওই দিক দিয়েই চলে যাব। কমন্ রুমে গিয়ে ব্রজেশের কাছে সিল্কের পাঞ্জাবি আর চাদরটা রেখে তার কোটটা খুলে গায়ে দিলাম; প্রফেসার্স রুম থেকে গুপ্টা সাহেব বেরুচ্ছে—যথাসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে, মাথা নিচু করে বললাম, 'স্যার, বাবা খবর পাঠিয়েছেন—পিসিমা খুব অসুস্থ—যদি এটেণ্ডেন্স নিয়ে ছুটি দেন তো দেড়টার গাড়িতে...অবস্থা নাকি বড়ই সঙ্কটাপন্ন—ডিলিরিয়ামে খালি আমার নাম ক'রে...'

"টপ করে কি বললে জানো?—বললে, 'তাই তাড়াতাড়ি এসেন্সে বোঝাই হয়ে চলেছ বুঝি ছুটে?'

"কমন্ রুমে পাঞ্জাবিটা খোলবার সময় বুক পকেট থেকে রুমালটা পড়ে গেল, তুলে কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি গুঁজে নি—অত কি মনে থাকে?...সব তো বুঝিস্ বাপু—কে সঙ্কটাপন্ন—কার ডিলিরিয়াম বকবার অবস্থা—তায় নতুন বিয়ে করেছিস্, ভালো করেই বুঝিস, দিলেই পারতিস একটু ছুটি, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত?......সেখানে সে বেচারি হা-পিত্যেশ করে বসে আছে..."

নৃপেন দুঃখের ভান করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে হাতটা বাড়াইয়া বলিল, "আর বল না, আমি হঠাৎ কবি-বাল্মীকি হয়ে বুঝি শাপ দিয়ে বসি—মা গুপ্টা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতি সমা...ওঃ, লোকটা কি নৃশংস হে! তোমায় এই রকম উৎকট আঘাত দিয়ে কোন্ মুখে আবার নিজে শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

দেড়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই যে বিরহ, তাহার আলোচনায় দেবেশের মনটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একটু ভারী হইয়া পড়িল, ওদিককার বিরহবিধুর মুখখানি বোধ হয় বড় স্পষ্ট হইয়া

উঠিল বলিল, "চুলোয় যাক, তুমিও যেমন !....পকেটে দেশলাই রাখ ? একটু ধোঁয়া খেতে হবে, দেশলাইটা আনা হয়নি।"

নৃপেন বলিল, "না, আমার ও হাঙ্গামা নেই, তুমিই বা ধরলে কবে থেকে ?—আগে তো খেতে না।"

সিগারেটের বাক্সটা বাহির করিতে করিতে দেবেশ পাশের লোক দু'টির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপলোগ দিয়াশলাই রাখতে হ্যাঁয় ?"

একজন খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসিল মাত্র, অপর লোকটি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিককার গদি-বিহীন বেঞ্চের উপর গিয়া বাহিরের দিকে মুখটা বাড়াইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার গতিবিধিটা এতই আকস্মিক এবং অসংগত যে দুই বন্ধুতেই যথাসম্ভব চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল। দেবেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল, "একেবারে স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ! তা' যাক্, বাঁচা গেছে।" একটু চাপা গলায় বলিল, "এখন ইনি গেলে আরও একটু প্রাণ খুলে কথা কই।...হ্যাঁ, সিগারেট ধরাবার কথা জিগ্যেস করছিলে ? ভাই, শ্বশুরমশাই দেখে শুনে অনেক খোঁজখাঁজ নিয়ে দিব্যি একটি অতীব শান্তশিষ্ট, সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,—পানটি পর্যন্ত খায় না, মাটি থেকে চোখ তুলে কথাটি কয় না, নিরীহ, গোবেচারি, এক কথায় বলতে গেলে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তাঁর মেয়ে কিন্তু এ হেন জামাতা রত্নটিকে একেবারে বিগড়ে দিলে—চারিদিক দিয়ে—মস্তকটি চর্বণ করে দিলে আর কি, অবশ্য ক্রমশ...

"একদিন, কি যে বলে বেশ, একটা ইয়ের জন্যে খোশামোদ করছি—গিন্নী হঠাৎ বেঁকে বসলেন—'অত লক্ষ্মী, ভালো মানুষ, তোমার আবার এসব শখ কেন? এদিকে তো চুলটি পর্যন্ত আঁচড়াতে জানো না, পানটি খেতে জানো না।'

"সভ্য সভ্য প্রাণের দায়ে শ্রীহস্তের একটি পান খেয়ে সে-ঝোঁকটা সামলান গেল।—অধোগতির প্রথম ধাপ।

"পরের বারে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে, সেলুনে ঢুকে দিব্যি দশ আনা ছ' আনা করে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। মাথায় প্রথম টেড়ি উঠল।

"দেবী প্রথম দিকটা বেশ প্রসন্নই রইলেন। উৎসাহ পেয়ে যখন আবদার খুব বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ পরিবর্তন।

অপরাধ?

" 'ছোট পিসেমশাই যখন আসেন, সিগারেটের গন্ধে বেশ মনে হয়—হ্যাঁ, বাড়িতে জামাই এসেছে বটে। আমার সে সাধ মেটবার নয়, আমিও কারুর এ-সব বিদঘুটে সাধ মেটাতে চাই না···'

"কি করব বল?—ধরলাম।—পিস্‌শ্বশুরের টিন থেকে চুরি-করা চারটে গোল্ড-ফ্লেক আমার ব্রতভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করছিল, শ্বশুরের কন্যা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।···তারপরে গোঁফজোড়াটির উপর শুভদৃষ্টি পড়ল। তোমার গাঁ ছুঁয়ে বলছি নৃপেন, আমার অমন যত্নকরে পোষা নিরীহ গোঁফ জোড়াটির ল্যাজ কেটে তাকে এরকম উগ্র আর তেজী করে তোলবার আমার কখনই ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি রকম বেকায়দায় আমায় ফেলে যে···তা যদি শোন···"

"নিশ্চয় শুনব" বলিয়া নৃপেন বন্ধুর দিকে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল; তাহার পর যেন বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এইভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি যে ভয় পাইয়ে দিলে হে—ওঁদের মন পাওয়া তো নেহাত চাড্ডিখানি কথা নয় দেখছি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্রীপাদপদ্মে ভালো ছেলে বলে যে এতদিনকার সুনাম তা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, ঘাড়ের চুল, গোঁফের মূল বলিদান দিতে হয়েছে—অথচ এখনও আইবুড়োর গন্ধ ভাল করে যায় নি।···আচ্ছা, প্রফেসর গুপ্টা তাহ'লে কি দিয়ে দেবী-মর্যাদা রক্ষা করলেন? সে-বেচারির তো গোঁফ-সম্পদও ছিল না, আর সিগারেট তো তাঁর একটা অঙ্গবিশেষই ছিল বললেই চলে..."

দেবেশ বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি গুপ্টা সাহেবকে দেখ নি এদিকে?—তাঁকে বাবরী রাখতে হয়েছে,

চাপদাড়ি আর গোঁফ কালচার করতে হয়েছে—যেন মাঝবয়সের রবিবাবুটি ; সিগারেটের পাটই উঠিয়ে দিতে হয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে শুদ্ধ, সনাতন পান আর দোক্তা—ভিন্নরুচির্হি স্ত্রীলোকাঃ··· এখন যদি সামনে গুপ্টা সাহেবকে দেখ তো আর চিনতে পারবে না—সে স্মার্টনেস্ কোথায় গেছে—এখন দেখবে দিব্যি নাদুসনুদুস গেরস্ত—"

"বটে !"

"তবে আর বলছি কি ?—তুমি এস না একবার কলেজে, একবার নব কলেবরটি দেখে যাও,—চলে এস একবার···"

অতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।—

এই সময় গাড়িটি পুশা রোড্ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়া গতিবেগ কমাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে, কি নিগূঢ় কারণে তা' হনুমানজিই জানেন, বিজলি বাতি দু'টি সমস্ত কামরাটি অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিতের মত যেন একেবারে তাজা হইয়া !

দুই বন্ধুতেই দেখিল—পাশেই, দাড়িগোঁফে আবৃত মুখ, বাবরীর মাঝখানে সিঁথে কাটা, নাদুসনুদুস গেরস্ত গোছের একটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া আছে ; মুখের পান চিবান হঠাৎ বন্ধ করায় গালদুটি ঈষৎ ফোলা, গায়ে শ্বশুরবাড়ির উপযুক্তই বেশভূষা···

চিনিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

পানটা চিবাইতে আরম্ভ করিয়া জড়িত রসনায় কহিলেন, "এই যে দেবেশ দেখছি···ইয়ে, তোমার পিসিমা···মানে, এই গাড়িতেই যাচ্ছ বুঝি ?···"

উত্তর দরকার হয় না,—এই গাড়িতেই তো যাইতেছেই, এক সঙ্গে আসিতে হইল এতটা ; তবুও সম্মোহিতের মত দেবেশ মাথা নিচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ,—মাসিমার ভাগ্নী···ইয়ে, পিসিমার বড্ড...আপনি বুঝি—এই গাড়িতেই ?···"

ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াইল।

গদিহীন বেঞ্চ হইতে অপর ভদ্রলোকটি ততক্ষণ উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া দরজামুখো হইয়াছেন।—সামনে কুলির মাথায় একটা বড় চ্যাঙারি, ওপরে বাছা বাছা ক'টা ল্যাংড়া আম দেখা যায়। দেবেশ ঘুরিতেই চোখাচোখি হইয়া গেল!—

"এই যে বাবাজি···এই গাড়িতেই বুঝি আসা হ'ল?...আমি ভাবছিলাম বুঝি···থাক্ থাক্, দীর্ঘজীবী হও···প্রণাম হয়েছে—ওঠ···"

ভক্তিমান জামাইয়ের তখন মাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কি ঘোর সমস্যা শ্বশুর বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

চল্লিশ বৎসরের দুই প্রান্তে

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বেই এই বাড়ির কর্তা ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়,—গঙ্গাধর বাচস্পতি। অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, এদিকে স্মৃতি আর ন্যায়েও অসাধারণ অধিকার। সভাপণ্ডিতির জন্য একদিকে বর্ধমান অপরদিকে কৃষ্ণনগর থেকে টানাটানির আর অন্ত ছিল না। যান নাই। বলিতেন, "বোনের দাসী করে রাখবার জন্যে কি মা-সরস্বতীকে তপস্যা করে ঘরে আনলাম ?"

একটি চতুষ্পাঠী ছিল—নবদ্বীপ, মিথিলা এমন কি বারাণসী থেকেও ছাত্রসমাগম ছিল তাতে।

লোকে বলে, "দাম্ভিক ছিলেন। কত কি করে যেতে পারতেন, কিন্তু নিজের কোট ছেড়ে এক পা নড়লেন না কখন···"

ছিলেন নিশ্চয় অটল, দাম্ভিক।...সমুদ্র তো আর নিম্নগা নদীর প্রকৃতি অবলম্বন করিতে পারে না।

যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের এখনও বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসা উঠিলে মনে পড়ে একটি দীপ্ত সৌম্য পুরুষসিংহকে,—উন্নত ললাট, দীর্ঘ নাসা, প্রশস্ত বক্ষে সংযত জ্যোতিচ্ছটার মত শুভ্র যজ্ঞোপবীত, প্রোজ্জ্বল অগ্নি-শিখার মত রক্তাভ, সুগৌর, ঋজু, দীর্ঘ কলেবর। তখন ফুট-ইঞ্চি দিয়া দৈর্ঘ্য মাপিবার রেওয়াজ হয় নাই। দেশে সংস্কৃত-চর্চা ছিল,—"রঘুবংশের"র দিলীপের তুলনা দিয়া লোকে বলিত—'শালপ্রাংশু।'

তিনি ছিলেন এক নাম, এক রূপ আর এক প্রতিজ্ঞায় চিরপ্রতিষ্ঠিত।

কিঞ্চিদূর্ধ্ব চল্লিশ বৎসর পরে, এখন এ বাড়ির কর্তা রমণীমোহন—বাবু রমণী মোহন ভট্টাচার্য, বাচস্পতি মহাশয়ের পৌত্র। চার ফুট

নয় ইঞ্চির মানুষটি, গড়ন পাতলা-পাতলা শৌখীনগোছের। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর। রমণীমোহন—এই ফিনফিনে নামের জন্যও, এবং অনেকটা স্বল্প, সুকুমার দেহের জন্যও স্কুলে তাহার নাম হইয়াছিল 'লেডি'। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে সেটা এখনও জারি আছে।

ঠাকুরদাদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লোক ছিলেন, রমণীমোহনের চরিত্রে তাহার অঙ্কুর ছেলেবেলা হইতেই দেখা গেল,—যেটা ভালো লাগিবে না সেটাতে কোন মতেই লাগিয়া থাকিবে না। কিছু সংস্কৃত পড়িল, ভালো লাগিল না, ছাড়িয়া দিল। গ্রামের স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িল, তাহার পর আর ভালো লাগিল না। কলিকাতায় গিয়া মেসে থাকিয়া ম্যাট্রিক দিল, আই-এস্-সিটাও পাস করিল; কিন্তু আর ওসব ভালো লাগিল না। বন্ধু-বান্ধবেরা বিস্তর বোঝাইল, অভিভাবকেরা বোঝাইল, চোখ রাঙাইল; মেয়েরাও কাঁদিয়া চোখ রাঙা করিল, কিন্তু রমণীমোহন অটল, ছেলেবেলায় যা মাত্র জিদ ছিল তা এখন স্ট্রং প্রিন্‌সিপ্‌লে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শুধু একটি কথা যেন নখে-দন্তে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল, "আর ভালো লাগছে না।" কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিল।

মাঝের কয়েক বৎসরের ইতিহাস আরও দ্রুত ভালো লাগা না-লাগার কাহিনী। তাহার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরিয়া চরকা-তকলি কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া চৌমাথায় দাঁড়াইয়া গান্ধীর চৌদ্দপুরুষান্ত করা—সবই আছে। এমন কি প্রায় সব ছাড়িয়া যে ছাগলিটির দুধের উপরই দিনকতক জীবনতরী বাহিয়া রাখিয়াছিল গান্ধীর উপর আক্রোশে সেটির বাচ্চার উপর দিয়াই এক সময় উগ্ররকম আমিষভোজী হইয়া উঠিল। কিন্তু উদরের ভালো লাগা না-লাগা বলিয়াও একটা ব্যাপার আছে; ছাগলির-দুধ-খাওয়া দুর্বল নাড়িতে তাহার ছানাদের হাড়-মাংস-চর্বি বরদাস্ত হইল না। খুব এক চোট পেটের ব্যারামে ভুগিয়া পছন্দসই নূতন পথ খুঁজিবে এমন সময় তাহার পিতার মৃত্যু ঘটিল।

দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মিলাইয়া জমিজমা নিতান্ত নিন্দার যোগ্য নয় ; কিন্তু রমণীমোহনের জীবনের চরকার যুগ অনেকদিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন প্রিন্‌সিপল্ বদলাইয়াছে, শুধু মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা ভাল লাগিল না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল,—একটা বাড়ির কর্তা, অথচ চাকরি করে না, এটা যেন কি রকম একটা খাপছাড়া ব্যাপার হইয়া পড়ে—কেমন যেন নেড়া-নেড়া ভাব একটা —ঠিক কারণ দেওয়া যায় না, ঠিক বর্ণনা করাও যায় না···তবে শরীরের উপরে মাথাটিতে চুল না থাকার সঙ্গে বাড়ির কর্তার চাকরি না-থাকার নিশ্চয়ই কোন দিক দিয়া যেন একটা সাদৃশ্য আছে।

হাওয়ায় পরিবর্তন ঘটে ; তাই এই বাড়ির এক কর্তা এক সময় রাজসভায় হাজরি দেওয়ায় অসম্মান জ্ঞান করিত, আর অন্য সময় অন্য এক কর্তা প্রবল উৎসাহে সবুট চরণ-সকাশে ভিক্ষাপাত্র নিবেদন করিতেছে—আই হ্যাভ দি অনার্ টু বি ইত্যাদি, অর্থাৎ হে দাতা, তোমার নিতান্ত অনুগত দাসের বৃত্তিই আমার পরম সম্মান।

চাকরি হইয়াছে। রমণীমোহন এখন ডেলি প্যাসেঞ্জার। আশ্চর্যের বিষয়, ভালো না-লাগার অমন যে একটা উগ্র বৃত্তি ছিল রমণীর মনে এতদিন, সেটা প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর তাহার সমস্ত জীবনের উপর দিয়া বিজয়-অভিযান করিয়া এইবার যেন শান্ত, সংযত হইয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে এই একটা অবস্থা আসিয়াছে যাহা বেশ দিব্য ভালো লাগিতেছে —এইটা দাসত্বের অবস্থা।

বাচস্পতি মহাশয় এক নামেই দেশবিশ্রুত ছিলেন, পৌত্র এরই মধ্যে তিনটি নামে খ্যাত হইয়া পড়িয়াছে—রমণীমোহন, লেডি আর ছোটবাবু। শেষের নামটা এখনও আপিসেই আবদ্ধ আছে, পুষ্ট হইয়া একদিন 'বড়বাবু'তে দাঁড়াইবে, ক্রমে গ্রামে আসিয়াও চারাইয়া পড়িবে।—রমণীমোহনের এখন সবচেয়ে উচ্চ আশা এই।···এ ভিন্ন লোক্যাল ট্রেনের দৈনিক রাজনীতি-বৈঠকে স্বরের উচ্চতা এবং আলোচনার উগ্রতার জন্য রমণীমোহনের বিশেষ নাম আছে, তবে সেটা গাড়িতেই নিবদ্ধ—সঙ্গে করিয়া নামিতে হয় না।

শুধু বহু নামই নয়, কর্মের দিক দিয়াও বাচস্পতি-পৌত্রের পিতামহ হইতে বিশিষ্টতা আছে। তাহার মূলেও প্রিন্‌সিপল্, থিয়োরি প্রভৃতি কতকগুলি জটিল ব্যাপার আছে যাহা এ-যুগের মানুষের জীবন আরও সমস্যাঘন করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহা দ্বারা সে নিজেকে ভালো মত ঠাহর করিতে পারিতেছে না, নিজের একটি নিজস্ব রূপ দাঁড় করাইতে পারিতেছে না।—অত্যুগ্র নাগরিক জীবন আছে আবার ব্যাক-টু-ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের সঙ্গে নাড়ির যোগের কথাও আছে; দেবদেবী আছেন, কুলধর্ম আছে, আবার এদিকে উদার বিশ্বমানবতাও আছে, সাহেব না হইলেও এক পা চলা দায়, আবার এদিকে স্বরাজ আছে, বিপ্লবের জয়গানও চাই—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সবেরই মর্যাদা রক্ষা করিতে হয় একটু-আধটু করিয়া। সারা যুগটাতেই থিয়োরি আর প্রিন্‌সিপ্‌লের জট পাকাইয়া গিয়াছে। গঙ্গাধর বাচস্পতির যুগটা ছিল 'না' অথবা 'হ্যাঁ'-এর আপোষের সব কিছুর সঙ্গে মানাইয়া বেশ মানানসই হইয়া চলিবার যুগ। যুগের দুইটার মধ্যে আপোষের অবসর ছিল না—রমণী-মোহনের যুগটা 'না' এবং 'হ্যাঁ'-এর এই মূল তত্ত্বটাই তাহার জীবনের প্রতি দিনটিতে মূর্ত হইয়া উঠে।...যে-কোন একটা দিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক্।

রমণীমোহন ভোরে উঠিল,—অবশ্য সে-যুগের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নয়, কেননা এ-যুগের হাইজীন্ অর্থাৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলিতেছে তাহাতে এক্সপোজারের ভয় আছে।...প্রাতঃকৃত্য সারিয়া একটা খাটো ময়লা কাপড়ের উপর গামছাটা জড়াইয়া হাতে একটা দা লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিয়া গেল। এ ব্যাপারটা ব্যাক্-টু-ভিলেজ, গ্রামের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিতালি। আজ কিন্তু বেশি সময় দিতে পারিবে না রমণী; ষষ্ঠীপূজা আছে; আটটি যজমানের বাড়ি হাজিরা দিতে হইবে। হাতে একটি রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা, ঘুরিয়া ফিরিয়া এ-গাছটার মাথায় কোপ, ও-লতাটার গোড়ায় কোপ বসাইয়া ঠিক

পনর-মিনিট-ব্যাপী যেন একটি ল্যাবরেটরি-গ্রাম্য জীবন অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা বিড়ি ধরাইল, সেটা ভস্মীভূত করিয়া তেল মাখিয়া তালপুকুরে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নানের পরের রমণীমোহন একেবারে অন্য লোক। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় সাবান দিয়া কাচা ঝকঝকে পৈতা, গায়ে নামাবলী, কপালে, কর্ণমূলে চন্দনের রেখা, টেড়ির ও-প্রান্তে টিকিটি বড় বড় হালফ্যাশানী চুলের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র করা, একটি বিল্বপত্র বাঁধা; ডান হাতের অনামিকাতে একটি কুশাঙ্গুরীও পরানো। রমণীমোহন বাড়িতে রান্নার তাগাদা দিয়া ষষ্ঠীপূজা অভিযানে হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। মনটা আরও আগাইয়া গিয়া স্টেশনে ন'টা ছত্রিশের গাড়ির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আটটা বাড়িতে পূজা সারিতে আটটা পঁয়তাল্লিশ হইয়া গেল। অবশ্য পূজা যা হইল তাহাতে যজমানের রাতারাতি বংশলোপ হইবার কথা, নেহাত বাঙালী পরিবার বলিয়াই রমণীর পূজার উজান ঠেলিয়াও বৎসর বৎসর বংশবৃদ্ধিই হইতেছে।

হাতে ঠিক একান্নটি মিনিট। ইহার মধ্যে কাপড়-চোপড় বদলান, খাওয়া, একটু বিশ্রাম, গাড়ি ধরা। তবে বেশ কেমন করিয়া যন্ত্রের মত হইয়াও তো যাইতেছে মন্দ নয় এই বছর দুই ধরিয়া। ভাত বাড়িবার তাগাদা দিতে দিতে বাড়ি ঢুকিয়া রমণী প্রথমেই মণিবন্ধে ঘড়িটা বাঁধিয়া লইল। কাঁটার দিকে চাহিয়া কপাল কুঁচকাইয়া বলিল, "বাবাঃ—আজ আবার পুজোতে পাঁচ মিনিট দেরি করিয়ে দিলে—ঐ নটবর-কাকার বাড়িতে—নিশ্চয় গিন্নী নেই, ও-সব হালফ্যাশানের বউদের কি পুজোর যোগাড় করা পোষায়···কই গো, দিলে ভাত ?···নাঃ···"

আহারটি হাইজীন্ সঙ্গত—দ্রব্য হিসাবেও, রন্ধনের প্রক্রিয়া হিসাবেও, আবার আহারের পদ্ধতির দিক দিয়াও। দ্রব্যের দিক দিয়া বলা যায়—রমণী ঠাকুরদাদার যুগকেও অনেক পিছনে ফেলিয়া

গিয়াছে—অল্পস্বল্প নয়—প্রায় হাজার-আড়াইয়েক বছর, যখন তেল-মসলা এমন কি বোধ হয় কুলো-বঁটিরও ব্যবহার ভাল করিয়া জানা ছিল না। কুটনা কোটায় কিংবা রন্ধন-প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসেরই ভাইটামিনের উপর হাত পড়িয়াছে কি না ভালো করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া, হাত উল্টাইয়া ঘড়িটা কন্‌সল্ট করিয়া রমণী খুব সংযত ভাবে আসন গ্রহণ করিল। তাহার পর বাঁ হাতের কনুইটা খুব অনুভব করিয়া করিয়া বাঁ দিকের পাঁজরার নিচে খানিকটা প্রবেশ করাইয়া ঝুঁকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। (আপনারা জানেন না তাই হাসিতেছেন)—ইহাতে লিভার হইতে হজমের রস অবাধে নিষ্ক্রমণ হয়, হজমের সহায়তা করে। আহার্যগুলা দাঁতে পিষিয়া পিষিয়া স্যালিভার সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া আহার সমাপন করিতে করিতে ঠিক পঁচিশটি মিনিট লাগে। এতে দাঁতও অবিকৃত থাকে, পরিপাকও নির্দোষ রকম হয়। দাঁত এবং পরিপাকশক্তি দুইটাই খুব খারাপ বলিয়া রমণী ইহার এক মিনিট এদিক-ওদিক হইতে দেয় না।

"লেডির হল ?"—জয়হরি ডাকিয়া গেল, ন'টা বাইশ লোক্যাল ট্রেনের জয়হরি। রমণী তখন সংযতভাবে শ্বাস উর্ধ্বে টানিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, উত্তর দিল না। বাটিটা রাখিয়া তাহাতে খানিকটা জল ঢালিয়া সেটুকুও দুধের প্রথাতেই চুমুক দিয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিল, মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া নাকিস্মুরে বলিল, "আচ্ছা, কেন খাবার সময় ডিস্‌টার্ব করা বল তো ?—ঐটুকু ডেকে আপ্যায়িত না করলেই হত না ?—হল তো একটা বিঘ্নি খাবার সময় ?—এখন সামলাই সমস্ত দিন ধরে—"

ঢেকুর তুলিতে তুলিতে এবং পেটে টোকা মারিতে মারিতে উঠিয়া পড়িল।

মা বসিয়াছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "কি ঢেকুরের ঘটা বাবা বুড়োর মত। শ্বশুরঠাকুরের অত বয়সেও কেউ এ-সব উপদ্রব দেখে নি।"

রমণী আবার নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আরে রোজ দেখছ এই রকম একটা না একটা বিঘ্ন হচ্ছে! ঠিক খাবারটির সময়—নয় জয়হরে, নয় পেনো, নয় যতে......যত ওদের বারণ করি...হঠাৎ ঢুকে দিলে হজমের নাড়িতে শক্ লাগবে, তা শুনবে কেউ?"

আসন ছাড়িয়া আবার মূর্তি বদলাইয়া গেল। পূজাতে পাঁচ মিনিট সময় গিয়াছে—জয়হরেও মিনিট-খানেকের ধাক্কা দিয়া গেল। ঠিক সাত মিনিট আর সময় আছে, বাহির হইতেই হইবে। বিদ্যুৎ-চালিতের মত আঁচাইয়া, জুতা-জামা পরিয়া লইল, আজ আবার একটি ফালতু হাঙ্গামা আছে—পুজোর হাঙ্গামে টিকিটি পৃথক করা আছে—আঁচাইয়া বড় চুলের সঙ্গে সেটাকে আবার একাকার করিয়া দিতে হইবে, কপালের, কানের, ফোঁটা-চন্দন মুছিয়া ফেলিতে হইবে—সাহেব চটা বেজায় এসবে।

দেবতার পরে সাহেবের মন রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি এই সব ত্রুটি সারিয়া রমণী শুইবার ঘরে গিয়া একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা ডেক-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। স্ত্রী মনোরমা পানের ডিবা এবং একটা বিস্কুটের বাক্স হাতে করিয়া প্রবেশ করিল।

ডেক-চেয়ারের আরামটি বাঁধা পাঁচ মিনিটের, এই সময় স্ত্রীর সহিতও রুটিন-বাঁধা একটু একথা-সেকথা, একটু ফষ্টিনষ্টি হয়।... ডাক্তারি বিজ্ঞান বলিতেছে—আহারের পরেই শরীর এলাইয়া একটু রিল্যাক্সেশ্যন, আর হালকা গোছের একটু কথাবার্তা হজম এবং পরমায়ুর পক্ষে খুব উপকারী। তাহার মানে এই পাঁচ মিনিট মনোরমা একটা জারক ঔষধের শিশি। একটু কথা কওয়া, একটু হাসি, একটু ঠাট্টা-প্রশংসা—সে-সব সেবনের পূর্বে শিশিটাকে একটু নাড়িয়া লওয়া...ডাক্তারি বিজ্ঞানেরই একটা নির্দেশ—শেক্ দি ফায়েল বিফোর ইউজ...

"আজ ছোটবাবুর বড্ড দেরি হয়ে গেল, হাঁ করুন, পানটা আমিই না-হয় মুখে দিয়ে দিই, সময়ের সুসার হবে এখন।"

হাসিয়া মনোরমা ডিবা হইতে দুইটা পান বাহির করিয়া স্বামীর মুখে পুরিয়া দিতে যাইতেছিল, রমণী হাত উল্টাইয়া একবার চকিতে ঘড়িটা দেখিয়া লইল, "ওঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেল, আজ আর তিন মিনিটের বেশি রেষ্ট-এর জন্যে দেওয়া যাবে না"—বলিয়া প্রায় লাফাইয়া স্ত্রীর হাত হইতে পান দুইটা লইয়া তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দিল; মুখটা যে সে বেচারির কেমন-ধারা হইয়া গেল সেটা লক্ষ্য করিবারও ফুরসত নাই। ডিবাটা পকেটে পুরিল, বিস্কুটের টিফিন-বাক্সটা বাঁ হাতে লইল, তাহার পর পটের কালীর দিকে যুক্তকরে দাঁড়াইয়াই হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, "খুব মনে পড়ে গেল প্রণাম করতে গিয়ে,—আজ আমার আসতে দেরি হবে, লাস্ট ট্রেনে আসব।"

আবার ঘুরিয়া যুক্তকর তুলিতে যাইবে, মনোরমা প্রশ্ন করিল, 'কেন?"

আধ-ফেরা হইয়া রমণী বিরক্তভাবে বলিল, "সব কথায় টোকা কেন যাত্রার সময়?...আজ গোলদীঘিতে মহাবোধি হলে বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ পণ্ডিত ফাদার লা মোসা—'সত্যধর্ম ও ধর্মে অসত্য'—নিয়ে এক বক্তৃতা দেবেন...পারলে বুঝতে কথাটা? কেমন একটা ওবোঁস, ঢুকতেই হবে, হাজার তাড়াতাড়ি থাকুক লোকের!"

পুরা প্রণাম আর করা হইল না; তাড়াতাড়ি আর একবার পটের দিকে চাহিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই পটের দিকেই চাহিয়া চাহিয়া মনোরমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তবে ব্যাপারটা কিছু নূতন নয়, মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাজে বাহির হইয়া গেল।

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই বাড়ির, সম্ভবত এই ঘরেরই একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিলে চলে।

সময়টাও এই, অর্থাৎ দিবার প্রথম প্রহর মাত্র শেষ হইয়াছে,

সূর্য দেখিয়া অনুমান হয় ; তখন সূর্যের সঙ্গে সব দিক দিয়াই যোগটা নিবিড়তম ছিল।

গঙ্গাধর বাচস্পতি প্রাতঃকালীন পূজা-আদি সমাপন করিয়া এই ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; সদ্যসঞ্চিত পুণ্যে সমস্ত শরীর ভাস্বর, যেন সূর্যদেহচ্যুত একটি জ্যোতিঃ-শিখা। গৃহিণী একটি বঁটিতে উরু চাপিয়া একটি বড় থালায় নানাবিধ ফল কাটিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া, কাপড়ের চওড়া টক্‌টকে লাল পাড় কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "হল পুজো ?....দেখো..."

শেষের এই কথাটুকু একটা সতর্কতার বাণী। বাচস্পতি মহাশয়ের মাথাটা চৌকাটের উপর যায়, তাই সাবধান করিয়া দেওয়া।

মাথাটা নিচু করিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বাচস্পতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ও বলতে হবে না, স্বয়ং তুমি যখন ভেতরে রয়েছ, মাথা আপনিই নুয়ে আসবে।"

গালে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠায় গৃহিণীর নথটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "আর রঙ্গ করতে হবে না, বস এসে। বড্ড বেলা হয়ে যাচ্ছে আজকাল পুজোতে।"

"আর এদিক থেকে সময় ওদিকে যতটা যায় ততই ভালো ; এদিককার বেলাও তো পড়ে আসছে ?"

আসন পাতা ছিল, বাচস্পতি মহাশয় গিয়া তাহার উপর বসিলেন। গৃহিণী মিছরির পানা আর ফল, ভিজান মুগের ডাল ও ছানার থালাটা সামনে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "তা পড়ে আসছে বই কি।"

একটু লজ্জিত অথচ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। যাহাদের দিনমান কাটিয়াছে ভালো, বেলা যখন পড়ন্ত সে-সময় ব্যর্থতার অনুতাপে যাহাদের অতীতের দিকে চাহিতে হয় না, এ তাহাদের মুখের হাসি।

"মুগের ডাল আজ বেশি ভিজিয়েছ।"

"বৌমা ভিজিয়েছিলেন।...তা হোক, খেয়ে নাও, আবার সেই দুপুর গড়িয়ে গেলে ভাতে বসবে তো?"

বধূমাতা একটি কাল পাথরের রেকাবি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছ মরণ? আর মনেও থাকে না কিছু।...রেখে দাও ওঁর সামনে মা।...বউমার নিজের হাতের গড়া সন্দেশ, এবার বাপের বাড়ি থেকে শিখে এসেছেন। কেমন হল দেখ।...আজকালকার মেয়েরা যে শিখছে এই সব নানান রকম।"

অবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ রেকাবি শ্বশুরের সামনে রাখিয়া একটু কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। অভিমতের অপেক্ষা করিতেছে।

শ্বশুর ফলমূল থেকে হাত সরাইয়া ধীর আগ্রহে একটা সন্দেশ তুলিয়া মুখে দিলেন, বিচক্ষণতার সহিত আহার করিয়া বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার। তুমি ব'লে না দিলে মনে করতাম আমাদের তারু ময়রার মেয়ে গড়েছে বুঝি।...অতি মধুর।"

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। বধূর শরীরটিও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুলিয়া উঠিল। গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উনি অত মেহনত ক'রে গড়ে খাওয়ালেন, পুরস্কার হল, বেহানের গালাগাল খাওয়া—এমনই যুগই পড়েছে বটে!"

আর একটা তুলিয়া লইয়া বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "না, সত্যিই বড় উপাদেয় হয়েছে মা। রোজ আমার বরাদ্দ রইল, তবে এতগুলো ক'রে নয়—ছেলে তো তোমার বুড়ো হতে চলল কি না..."

আহারান্তে ধীরে-সুস্থে চতুষ্পাঠীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রচুর স্বাস্থ্যে, প্রচুর অবসরে, প্রচুর মুক্তিতে, সমস্ত সম্বন্ধ পূর্ণভাবে উপভোগ করা, সমস্ত রস নিংড়াইয়া পান করা, ওদিকে এক আত্মসমাহিত জীবন;—জীর্ণ, অকালবৃদ্ধ, অনবসর, শৃঙ্খলিত, স্বজনবিচ্ছিন্ন, চিরবুভুক্ষু, এদিকে এক শতবিক্ষিপ্ত জীবন।

মাঝে মাত্র চল্লিশটি বৎসরের ব্যবধান।

ঘরজামাই

বৈকাল বেলা গনশার মামা গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় চৌকির উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একটা 'আনন্দবাজার' পড়িতেছেন ; বাঁ হাতে চায়ের কাপ, ডান হাতে দাড়ি, মাঝে মাঝে চুমুক এবং তা দিতেছেন। গোরাচাঁদ বাহির হইতে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই আবার দেয়ালের আড়াল হইয়া গেল। ঘাড় গুঁজিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে যেন মাথার সমস্ত শক্তি দিয়া কি খানিকক্ষণ ভাবিল, তাহার পর দুই তিনবার পা'টা বাড়াইয়া এবং টানিয়া লইয়া শেষে খুব সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া চৌকির এক পাশটায় বসিল। গোলোক চাটুজ্যে একবার আড়চোখে দেখিয়া লইয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিলেন।

বেশ খানিকক্ষণ গেল। গোরাচাঁদ একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। গোলোক চাটুজ্যে আর একবার ঘাড়টা সামান্য একটু ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি খবর ?"

গোরাচাঁদ স্খলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "না, তেমন কিছু না··· এই····"

আরও খানিকক্ষণ গেল। তাহার পর দেয়ালের একটা ছবির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "শুনছিলাম— গণেশের নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে ?"

গোলোক চাটুজ্যে এবার ঘাড়ও ফিরাইলেন না ; কাগজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই বলিলেন, "কোথায় শুনলে ?"

কোন উত্তর নাই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে ; কোঁচার খুঁটে মুছিয়া গোরাচাঁদ নিঃশব্দে বসিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। বেচারা এ উত্তর মোটেই আশা করে নাই। আরও

খানিকক্ষণ যাওয়ার পর একটু উসখুস করিয়া বলিল, "গনশা বলছে ও বিয়ে করবে না... মানে..."

সেইরকম ধীর নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে ওকে বলছে করতে ?"

আবার চুপচাপ। গোরাচাঁদ দাঁতখোঁটা ভুলিয়া কিছুক্ষণ কড়ে আঙুলটা চিবাইল, তাহার পর যেখানে যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল জড়ো করিয়া বলিল, "তাহ'লে আসি আমি।"

শিবপুরের স্টীমার ঘাটে ঘোৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন এবং কে গুপ্ত উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, গোরাচাঁদ ভগ্নদূতের মত নিতান্ত মনমরা হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘোৎনা, রাজেন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল ?"

গোরাচাঁদ রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুখটা গঙ্গার দিকে ফিরাইয়া লইল। বুকটা চাপা রাগে ওঠানামা করিতেছে।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "হ'ল না রাজী ?···গেল একটু ঘাবড়ে-টাবড়ে ?"

গোরাচাঁদ মুখ ফিরাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "বকিস্ নি তিলে, আমার মেজাজ ভাল নেই। রাজী করা অত সহজ তো তুই নিজে গেলি নি কেন ? যা না, এখনও দাড়ি মুঠিয়ে বসে আছে।"

ঘোৎনা বলিল, "চটে উঠছিস কেন ? একটা কাজ নিজে ঘাড় পেতে নিলি তাই জিজ্ঞেস করছে লোকে..."

গোরাচাঁদ রাগিয়াই বলিল, "ঘাড় পেতে যেমন নিয়েছিলাম, চেষ্টা করতে কসুর করি নি। গোরাচাঁদ ভীতু নয়, অমন ঢের দাড়িওয়ালা মামা দেখেছে।···থাক দিকিন ঝাড়া একঘণ্টা জেলখানার মত একটা ঘরে বসে—কথা নেই বার্তা নেই, খালি মাঝে মাঝে চায়ে একটা চুমুক দেওয়া আর দাড়ি আঁচড়ান...না পারি উঠতে, না পারি..."

রাজেন একটু আগাইয়া আসিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "চুপ

করে বসে ছিলি ?—তোকে যেমন যেমন বলে দেওয়া হয়েছিল বলিস নি ?”

গোরাচাঁদ তেমনিভাবেই কহিল, “বলিস্ নি। ওর যেমন যেমন উত্তর দেওয়ার কথা তা দিয়েছে ? ছুটো কথাতেই এমন বলবার পথ আটকে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল !···ঘাগী লোক, ওকে ভাঁওতা দিয়ে বিয়েতে রাজী করবেন—ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছেন !···এমন অবস্থা দাঁড় করালে মনে হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—নাক-কান মলছি, আর ঘটকালিতে কাজ নেই···”

নিরাশ হইয়া রাজেন, ত্রিলোচন প্রভৃতিও রাগিয়া উঠিতেছিল, রাজেন বলিল, “তোকে পাঠানই বোকামি হয়েছিল, নেহাত ওপর-পড়া হয়ে যেতে চাইলি···আমি হলে···”

গোরাচাঁদ বলিল, “লবাবি রাখ্ রাজেন···আচ্ছা বেশ, তোকে বেশি কিছু করতে হবে না ; তুই শুধু তু'টি কথার উত্তর দে—'কোথায় শুনলে ?'···'কে করতে বলেছে ?' দে উত্তর দেখি কত বড় মুরোদ।”

যেন একটা হেঁয়ালি শুনিতেছে এইভাবে হাঁ করিয়া গোরাচাঁদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, “সবটা ভেঙে বল্ ; না, মাঝখান থেকে...”

ঘোৎনা কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, বলিল, “বুঝেছি—ও যেই বলেছে—'শুনলাম নাকি গনশার বিয়ে হচ্ছে'—ওর মামা আমরা যা ভেবেছিলাম তা না বলে জিগ্যেস করেছে—'কোথায় শুনলে'।··· তা তুই কেন একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে দিলি না তাড়াতাড়ি ? যেমন ধর—যেমন ধর, 'রাজেন বলেছে'।”

রাজেন তাড়াতাড়ি ভীতভাবে বলিল, “আমার নাম করা কেন মাইরি ?—গোরা ন্যায়রত্ন-মশাইয়ের নাম করলেই পারত ; কালা মানুষ, তার কাছে কেউ ভজাতে যেত না।”

সত্যই এই সামান্য বুদ্ধিটুকু যে কেন মাথায় আসে নাই ভাবিয়া গোরাচাঁদ ঘোৎনার মুখের পানে একটু অপ্রতিভভাবে চাহিল।

ত্রিলোচন বলিল, "আর দোষ দেওয়াও যায় না গোরার। বেজায় ধড়িবাজ আর রাশভারী লোক; দেখছিস না অত চালাক গনশা—সেও এখনও মুখ দিয়ে একবার 'হ্যাঁ' বলাতে পারলে না। সেই যে কোট করে বসে আছে—আগে চাকরি না হলে দেবে না গনশার বিয়ে ..."

এমন সময় কে গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "ঐ গণেশবাবু আসছেন।"

স্টীমার এইমাত্র আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে। গণেশ নামিয়া কতকটা বিমর্ষভাবে পণ্টুন বাহিয়া উঠিয়া আসিল।

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কোথায় ছিলি চোপোর দিন? কতবার খোঁজ করলাম..."

গনশা উত্তর করিল, "মামা চাকরি খুঁজতে পাট্টেছেলো।"

ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "কি হল?"

গনশা বলিল, "ত্রি-টু-ওয়ান।"

সকলে বিস্মিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিল। চাকরির পেছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গনশার মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি!

গণেশ গোরাচাঁদের হাত হইতে বিড়িটা লইয়া একটা টান দিয়া বলিল, "গ-গ্ গনশার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, চাকরি খুঁজুক! ইডেন গার্ডেনে বার্মিজ প্যাগোডার নিচে নি-নিদ্রা দিয়ে ম্যাচ দেখে আসছি—ইস্টবেঙ্গল ক্যামারুন্‌স্...ত্রি-টু-ওয়ানে..."

কে গুপ্ত প্রশ্ন করিল "ইস্টবেঙ্গল দিলে না খেলে?"

"দিলে মশাই।—প-পদ্মাপারের গোঁ!"

গোরা প্রশ্ন করিল, "খেললে কেমন?"

গনশা বলিল, "তু-দ্দুটো এসা পেনালটি মিস করলে—ইচ্ছে হল নেমে গিয়ে দিই বাঙালকে চড়িয়ে...."

রাজেন বলিল, "কাজটা কি ভাল করলি গনশা?—তোর মামাকে কি বলবি —যখন জিগ্যেস করবে কি হল চাকরির...."

"বলব কা-ক্কাল ডেকেছে।"

"তারপর ?"

"কাল ডেকেছে।"

"তারপর ?"

গনশা বলিল, "আবার কা-ক্কাল ডেকেছে। ফুটবল সিজিনটা এই করে মা-ম্মামার ট্যাঁক হালকা করতে হবে,—আট গণ্ডা ক'রে পয়সা দিচ্ছে ট্রাম-বাসের জন্যে।....মা-ম্মামীকে বলছিল—'এতদিনে সুমতি হয়েছে গনশার, তবু বেরুচ্ছে চাকরির জন্যে।' মামীও সুমতি দেখে কালীঘাটের মানৎ ক'রে পাঁচটা টাকা তুলে রেখেছে,—ফা-ফাইনালের দিন সেটা হাতাতে হবে; তোরাও সব যাবি দেখতে..."

রাজেন ফুটবলের তত ভক্ত নয়, একটু অধৈর্য হইয়া বলিল, "কাজের কথায় আয়। আজ এক মতলব এঁটেছিলাম গনশা, গোরেটা কাঁচিয়ে দিলে। সবাই ঠিক করলাম—তোর মামার কাছে এবার উল্টো চাল দিতে হবে—তুই বিয়ে করতে চাইছিস না ব'লে দিই ভড়কে বাপধনকে, তাহ'লেই তাড়াতাড়ি খোঁজাখুজি করতে পথ পাবে না..."

গনশা উধ্বর্দিকে মুখ তুলিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে অনাসক্ত-ভাবে প্রশ্ন করিল, "তা কি বললে ?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বলিল, "বললে—'কে করতে বলছে ?'... ঐ কথার ঐ উত্তুর হল, তুই-ই বল না গনশা। হোক তোর মামা গুরুজন, কিন্তু..."

গনশার বোজা মুখের মধ্যে দাঁতে দাঁতে ঘষার একটা চাপা শব্দ হইল, বোধ হয় গুরুজনকে চিবাইয়া ফেলিবার ইচ্ছায়।

রাজেন বলিল, "তাই বলছিলাম—পয়সাগুলো বাজে খরচ না করে দেখই না একটা চাকরির চেষ্টা।"

কে গুপ্ত বলিল, "গণেশবাবু যে রাজী হবেন না, নৈলে সেজ-কাকার মুখে শুনছিলাম তাঁদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে।"

সকলে বিস্মিত হইয়া কে গুপ্তের পানে চাহিল, ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "রাজী হবে না মানে? অ্যাদ্দিন ধরে দেখছেন ওকে, কবে গর্‌রাজীর ভাবটা দেখলেন শুনি?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "কাদের বাড়ি কাজ করেন আপনার সেজকাকা?"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কি চাকরি? কতদিন হল শুনেছেন মশাই? বলতে হয় এতদিন,—দেখছেন..."

চারিদিকের প্রশ্নে থতমত খাইয়া গিয়া কে গুপ্ত বলিল, "শুনেছি অনেকদিন হল, ঘরজামাইয়ের চাকরি..."

সকলে আরও বিস্মিত হইয়া চাহিল, কে গুপ্ত যতটা সম্ভব গুছাইয়া লইয়া বলিল, "বলছিলাম চাকরি ভাল—সেজকাকার ছোট সাহেবের পারসনাল ক্লার্ক না কি...তবে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে..."

গনশা এতক্ষণ দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছিল,, প্রশ্ন করিল, "ছো-চ্ছোট সায়েবের নাকি মশাই?"

কে গুপ্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, বড়বাবুর; তারই হাতে চাকরি কিনা।...বলিনি আপনি রাজী হবেন কিনা..."

রাজেন বলিল, "রাজী হতে কি হয়েছে? যার অমন মামা তার গৃহ আর অরণ্যে তফাতটা কি?... কতদিন হল বলেছিল সেজকাকা? আপনি একটি আস্ত..."

ঘোৎনা বলিল, "ওকে বকচিস কেন? আগে গনশা বলুক ও রাজী কিনা। সামান্য একটা চাকরির লোভে ঘরজামাই হয়ে থাকা..."

ত্রিলোচন বলিল, "শুধু তো চাকরি নয়, ওটাতো উপরি পাওনা; চাকরির সঙ্গে একটা কি যে বলে, বৌও পেয়ে যাচ্ছে তো? আর শ্বশুরের মেয়েকে একবার দুটো মন্ত্র আউড়ে দখলে এনে ফেলতে পারলে শ্বশুরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের বাড়ি টেনে তুলতে কতক্ষণ? আইন তখন তোমার দিকে।"

রাজেন একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিল, "আদালতের আইনের ওপরেও একটা আইন আছে, তার খবর তোমরা কেউ জান না বলেই বলছ—সে হচ্ছে…"

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "প্রিভি কাউন্সিল ?"

রাজেন বোধ হয়, হৃদয়, কি প্রেম, কি ভালবাসা—এইরকম গোছের কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, রসভঙ্গে হঠাৎ বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোর দুবচ্ছর বিয়ে হল গোরে, কিন্তু যে-কে সেই রয়ে গেলি। খালি শ্বশুরবাড়ির খ্যাঁটটা চিনেছিস !"

ত্রিলোচন বলিল, "ঘরজামাই হওয়া এত খারাপ কিসে আমার বুদ্ধিতে তো আসছে না। মামার বাড়িতে 'গনশা', সেখানে 'জামাই-বাবু'; মামার বাড়িতে কথায় কথায় 'চাকরি করগে যা'; সেখানে শ্বশুর বড়বাবু, সারাটি মাস গা এলিয়ে পড়ে থাক, মাস পোহালে পয়লা তারিখে হক্কের মাইনে এসে হাজির,—মামার বাড়িতে…"

রাজেন বলিল, "ঠিকই বলছে তিলে। বৌয়ের দিক থেকেও দেখ,—এখানে বাড়ির বৌ—খেটে খেটে হয়রান—সমস্ত দিনে দেখাটি হবার যো নেই; সেখানে বাড়ির আদুরে মেয়ে—কাজ নেই কর্ম্ম নেই, সমস্তদিন মুখোমুখি হয়ে গল্প চালাও…"

গল্প করিতে করিতে সকলে জেটি ছাড়িয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইল। কে গুপ্তকে বলা হইল, সে কাজটা সম্বন্ধে যতটা পারে খবর সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

শিবপুরের ট্রাম ডিপোর কাছে নীলুর দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চি দুইটাতে রাজেন, কে গুপ্ত, ঘোৎনা এবং গোরাচাঁদ বসিয়া আছে। ফুটবল, বায়স্কোপ প্রভৃতি লইয়া এলোমেলো গল্প হইতেছে, দোকানের ভিতর নীলু আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে দুলিতে বিড়ি পাকাইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক আধটা মন্তব্য করিতেছে।

ত্রিলোচন ট্রাম হইতে নামিয়া মন্থর গতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—ঘোৎনা, রাজেন প্রশ্ন করিল, "একলা যে ?"

ত্রিলোচন বলিল, "দোকলা এক ব্যাটা পশ্চিমাকে ফোকলা করে পিটটান দিয়েছে....স্টীমারে আসবে।···নীলে, একটা পান ছাড় দিকিন তাড়াতাড়ি, একটা বিড়িও ; বেদম করে দিয়েছে।··· তাড়াতাড়ি স্টীমারঘাটে চল সব।"

ঘোৎনা ধমক দিয়া বলিল, "ব্যাপার কি তাই খুলে বল্, তা নয়..."

নীলু পান আর বিড়ি দিয়া বলিল, "মনে হল যেন তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ এসেছে তিলুদা, ট্রাম থেকে নেমে জিগ্যেস করলে নিবারণ মাইতির বাড়ি কোথায়। জিগ্যেস করতে বললে কালসিটে থেকে আসছে।"

ত্রিলোচন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "খেলে কচুপোড়া! আর আসবার দিন পেলে না ?···তোরা এগো ঘোৎনা, আমি এলাম বলে।...বিড়িটা রেখে দে নীলে মুখে গন্ধ পাবে ; বউ আবার রটিয়েছে, আমি বিড়ি-সিগারেটের ওপর ভয়ানক চটা।···একরকম জ্বালা ?"

এরা ঘাটের কাছে পঁহুছিয়াছে, দেখা গেল ত্রিলোচনও হনহন করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতেছে। আসিয়া বলিল, "খুড়শ্বশুর এসেছে—সেই জগুদা !"

জগুদার উপর কাহারও বিশেষ ভক্তি না থাকায় কেন আসিয়াছে, কি বৃত্তান্ত কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। সকলে আসিয়া জেটিতে উপস্থিত হইল।

স্টীমার আগেই আসিয়া গিয়াছিল ; গনশা নামিয়া পণ্টুনের রেলিঙে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল, ইহারা গিয়া কেহ এ-রেলিঙে, কেহ ও-রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোৎনা বলিল, "তিলে বলছিল কার সঙ্গে মারামারি করেছিস নাকি ?"

গনশা কি একটা কথা ভাবিতেছে, খুব বেশি অন্যমনস্ক।

ত্রিলোচনই বলিল, "বাধ্য হয়ে করতে হল! ট্রামে পাশের সীটটাতে বসে ছিল, কোনমতেই একটু নড়ে বসবে না। তবু গণেশ বেচারি ভালভাবেই কথা কয়ে যাচ্ছিল, একটা মস্ত বড় অশান্তি লেগে আছে—ঝগড়ার দিকে মন নেই। শেষে সে বেটা একেবারে তেরিয়ান হয়ে বললে তার ভাগনে পুলিসে কাজ করে। বেটা একজনের মামা হয় দেখে গণেশ আর রাগ চাপতে পারলে না··· নিজের মামাকে তো আর কিছু বলতে পারে না, একটি রদ্দাতে দুটি দাঁত খসিয়ে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে···"

গনশা বিড়ির ধুঁয়াটা উপরের দিকে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল,— "মা-ম্মাগিরি ফলাতে এসেছিল..."

গোরাচাঁদ বলিল, "সত্যি, মামার ওপর ভক্তিতে ও বেচারা যেন গলে যাচ্ছে!···কালকে যখন বললাম বিয়ে করতে চাইছে না গনশা, একবারটি শিউরে পর্যন্ত উঠল না রে, সেই একভাবে কাগজ পড়ে যেতে লাগল!···উনি পুলিসের মামা হন, তাই বলতে এসেছেন,— গনশার কাছে!"

রাজেন বলিল, "দোষ দেওয়া যায় না গণেশের। এই রকমই হয় কি না;—কারুর মাসী-পিসীকে দেখ, মনে দিব্যি একটা ভক্তির ভাব আসবে; কিন্তু কারুর শালী নজরে পড়ুক দিকিন—সেই বয়েসেরই—মনে হবে একটু ঠাট্টা করে নিতে পারলে মন্দ হত না।···সে যাক্, বেটার মামা হবার সাধ মিটেছে;····আসল কাজের কি হল তাই বল।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে হল না। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যদি-বা বড়বাবুর অফিস পর্যন্ত পৌছুন গেল, টের পাওয়া গেল সে ছুটিতে, এক আধ দিনের জন্যে নয়, লম্বা এক হপ্তার ছুটি।····গনশাকে বলছি একটা পলার আংটি পর, তোকে গেরোয় ঘোরাচ্ছে, তা ..."

গঙ্গায় ভাটার টান চলিয়াছে। একটি মোটাগোছের শৌখীন ভদ্রলোক নৌকা হইতে এক হাতে পাম্পস্‌ অপর হাতে কোঁচা

ধরিয়া খুব সাবধানে কাদার উপর দিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কি করিয়া পিছলাইয়া গিয়া দুই তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। মোটা মানুষের পড়া চিরকালই একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার, কাদায় পড়িলে তো সোনায় সোহাগা ; সকলে—এমন কি গনশা পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল। ঘোৎনা বলিল, ''এত সাবধানে যাচ্ছিল লোকটা ; অথচ···"

লোকটা উঠিতে যাইয়া আবার বে-সামাল হইয়া যাইতেছে। গনশা বলিল, "আঙুলে বোধ হয় প-প্পলার আংটি নেই, দেখতো গিয়ে তিলে।"

গুমট ভাবটা কাটিয়া গিয়া একটু প্রফুল্ল হইয়াছে গণেশ ; বলিল, "নীলের দোকানের বিড়ি থাকে তো একটা দে তো ঘোৎনা। ...না, এ চাকরিটা হাতছাড়া হতে দোব না। স্টীমারে আসতে আসতে একটা মতলব বের করেছি।"

সকলে কৌতূহলী হইয়া মুখের পানে চাহিল। বিড়িটা ধরাইয়া গনশা বলিল, "ব-ব্বড়বাবুর আস্তানা পর্যন্ত ধাওয়া করব ভাবছি। খোঁজ নিয়েছি ; বা-ব্বাড়ি মার্টিনের লাইনে।"

ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "স্টেশন ?"

"কি যে দিব্যি নামটা। একটু বে-ব্বেয়াড়া গোছের, ঠিক মনে পড়ছে না। দাঁড়া,—সেখানকার কদমা আর নারকল-নাড়ু খুব নামী..."

কে গুপ্ত এদের পাল্লায় পড়িয়া অনেক ভোগান ভুগিয়াছে, একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "সেটা না জেনে যাওয়া..."

গোরাচাঁদ কদমা-নারকলনাড়ুর আঁচ পাইয়াছে, একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তো আপনি যাবেন না মশাই, শিবপুরের ছেলে ঠিক বের করে নেবে।...হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যেখানকার সীতাভোগ নামী সেখানকার টিকিট চান তো—শেওড়াফুলির দেয় কি বর্ধমানের দেয় দেখি।"

রাজেন বলিল, "হাওড়া স্টেশনে গিয়ে অত হাঙ্গামা করতে হবে

না। ময়দান স্টেশনে গনশা টাইম টেবিলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই মনে পড়ে যাবে নামটা।”

ঘোৎনা বলিল, “তাহলে যাচ্ছে কে কে? সবাই?”

গনশা সংক্ষেপে বলিল, “স-স-সবাই ক্যাণ্ডিডেট। একসঙ্গে গাড়ি থেকে নেবেছি। কারুর নিজেদের মধ্যে জা-জ্জানা-শোনা নেই।

ত্রিলোচন বলিল, “ধর যদি তোকে না বাছাই ক'রে ঘোৎনাকে করে?”

গনশা বলিল, “নেবে না। বাড়ি এসে লিখে দেবে।”

রাজেন বলিল, “ঠিক তো, কেনই বা নেবে?—ওর তো হচ্ছেই বিয়ে।”

গোরাচাঁদ বলিল, “মনে কর যদি কে গুপ্তকে পছন্দ করে বসল—তাহ'লে?”

গনশা বলিল, “ও তো অমন এক মা-ম্মামার পাল্লায় পড়েনি।”

রাজেন বলিল, “মন্দ মতলব বের করে নি গনশা—যাকেই পছন্দ কর, সরে দাঁড়াবে। বাকি থাকবে শুধু ওই।”

বিলম্ব আর একেবারে করা সমীচীন, নয়, পরদিন সকালের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হইল।

সকালে চৌধুরীপাড়ার শিবমন্দিরে এরা সব একত্র হইল। গোরাচাঁদের বিলম্ব হইতেছিল। তাহাকে দূরে আসিতে দেখিয়া সবাই মন্দিরের রক থেকে নামিয়া অগ্রসর হইবে, ত্রিলোচন বলিল, “শিবঠাকুরকে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে হত না গনশা? চাকরির সঙ্গে বিয়েরও একটা চান্স রয়েছে···”

রাজেন বলিল, “যা ভয় করছিলাম; দিলি তো পেছনে ডেকে?”

গনশা একটু মুখটা কুঁচকাইয়া বলিল, “আর যার নি-ন্নিজের বিয়ে হতেই জটা দাড়ি পেকে গেছল!···”

অগ্রসর হইতে হইতে খানিকটা গিয়া ঘোৎনা চিন্তিতভাবে বলিল, "নেহাত ঠাকুর-দেবতার কথা তুলে বসল তিলে—তা ঘুরে একটু অন্নদা চাটুজ্জের রাধারমণের মন্দিরের সামনে হয়ে গেলে হত। ওই বরং এক দেবতা যে বিয়ে-থা এই সব বিষয়ে..."

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘাগী আছে।"

ঘোৎনা বলিল, "আমি বলছিলাম—বোঝে সোঝে ভাল আর কি..."

প্রথম ট্রেনটা ফেল করিয়াছিল। এরা একসঙ্গে হইলে ট্রেন লইয়া কোন-না-কোন একটা গোলমাল করিয়া বসেই।

অদৃষ্টও বেচারাদের বিরুদ্ধে চিরকাল চক্রান্তই করিয়া আসিয়াছে। যে-ট্রেনটা ধরিল প্রায় মাঝামাঝি গিয়া একটা জলার ধারে তাহার ইঞ্জিনটা বাগড়া দিল। গার্ড,, প্যাসেঞ্জার, ড্রাইভার সবাই আলোচনা করিয়া রোগটা ধরিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিল, সারিতেও লাগিল ঘণ্টাখানেক। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় সবাই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এগারটা প্রায় বাজিয়া গিয়াছে, ভাঙা ইঞ্জিনের উপর নির্ভর, কখন দয়া করিয়া পৌছাইয়া দিবে কিছুই বলা যায় না, এমন কি, পৌছাইয়া দিবে কি না, তাহারও কোন স্থিরতা নাই! অত্যন্ত গরম, ক্ষুধা,—আহারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা এই ছিল যে, স্টেশনের কাছাকাছি হোটেলে কিংবা দোকানে গিয়া কাজ সারা হইবে; কিন্তু স্টেশনগুলির স্বরূপের সঙ্গে যতই পরিচয় হইতেছে ততই বুকটা দমিয়া যাইতেছে।

তাহার উপর একঠায় বসিবার যো নাই, অসম্ভব রকম ছারপোকা, দাঁড়াইবার যো নাই, অসম্ভব রকম ঝাঁকানি, খালি পেটে খিল ধরিয়া যায়।

অথচ, বসিতেও হইতেছে, দাঁড়াইতেও হইতেছে। এমনকি, গরম, ক্ষুধা, নিরাশা, ঝাঁকানি, ছারপোকা—সব একজোট হইয়া

সবার চোখের পাতা ভারি করিয়া দিতেছে। গোরাচাঁদের চোখের পাতা একটু যেন ভিজা-ভিজাও মনে হইতেছে।

গোরাচাঁদ, কে গুপ্ত, রাজেন আর ত্রিলোচন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘোৎনা ঢুলিতেছে, গনশা পর্যন্ত সংযম হারাইতেছে—এমন সময় স্বপ্নের মতো একটা আওয়াজ কানে আসিল, "এ গাড়িতে শিবপুর থেকে কারাও এসেছেন কি ?—শিবপুর থেকে ?—শিবপুর ?"

সকলে প্রায় একসঙ্গে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। স্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন ছোকরা এমুড়ো-ওমুড়ো ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইতেছে—"কেউ শিবপুর থেকে এসেছেন কি ?—শিবপুর —শিবপুর থেকে ?"

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। ঘোৎনা প্রশ্ন করিল, "কিছু বুঝছিস গণশা ?"

গনশা ছোকরাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, "হ্যাঁ।"

রাজেন, ঘোৎনা একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কি বুঝেছিস ?"

কে গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "কি করে টের পেলে যে আমরা শিবপুর থেকে...."

গনশা ঘোৎনার কথার উত্তর দিল, "বুঝেছি, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা আসে নি।"

সকলেই প্রশ্ন করিল, "কারা ?"

গনশা সেই রকম ভাবেই বলিল, "কি জানি ?" তারপর হঠাৎ সজাগ হইয়া বলিল, "তু-তু'গ্‌গা ব'লে ঝুলে পড়তে হবে, নেমে পড়।"

প্লাটফর্মে নামিয়া হাঁকিল, "এই যে আমরা এখানে ; আ-আপনারা ওদিকে ডাকাডাকি করছেন কেন ?"

সমস্ত দলটি হুড়মুড় করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া এদের ঘিরিয়া ফেলিল। নানাবিধ প্রশ্ন, "এতক্ষণ উত্তর দেন নি...আপনারা এখানে, আর আমরা ওদিকে..."

গোরাচাঁদের একটু ভয় ভয় করিতেছিল, না বুঝিয়া-সুঝিয়া কোন্ ফ্যাসাদের মধ্যে পা বাড়াইয়া দিতেছে...বলিল, "উত্তর দিইনি, মানে আপনারা শিবপুরের কাদের খুঁজছেন—"

একটি রোগা, কুঁজো এবং মুরুব্বিগোছের ছোকরা দুইটা হাত তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে মশাই, নিবারণ মিত্তিরের বাড়ি এসেছেন তো ?"

সকলে যেন একটু থ হইয়া গেল, আড়ে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়িও করিয়া লইল—নিবারণ মিত্তির উহাদেরই উদ্দিষ্ট বড়বাবুর নাম।

ঘোৎনা আর গনশা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই..."

সেইভাবেই প্রশ্ন হইল, "শিবপুর থেকে এসেছেন তো ?"

সকলেই বিমূঢ়ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ছোকরা দু'টি হাত স্টেশনের বাহিরের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "তাহ'লে দয়া ক'রে চলুন। মার্টিনের পোষা ছারপোকায় সব গোলমাল করে দেয়, জানি আমরা।"

ছোকরা গ্রামের ছেলেদের রসিক সর্দারগোছের, ডাক নাম নোন্টু-দা। সকলে তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল।

স্টেশন থেকে বাহির হইয়া সকলে গাঁয়ের কাঁচা পথ ধরিয়া চলিল। কে গুপ্তের হাতে একটা সুটকেস ছিল, একটা গামছা, এক জোড়া তাস আর সবার একখানা করিয়া কাপড় আছে—সুবিধামত স্নানটা সারিয়া লইবে। 'আপনি কষ্ট করবেন কেন ?—আমায় দিন' বলিয়া একটি ছোকরা সেটি চাহিয়া লইল। রাজেন গনেশের গা ঘেঁসিয়া চলিতেছিল, তাহার উরুতে একটা চিমটি কাটিল, অর্থাৎ—ব্যাপারখানা কি ? গনশা চিমটি কাটিয়াই উত্তর দিল। তাহার পর গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া প্রশ্ন করিল, "নি-ন্নিবারণবাবু আছেন কেমন ?"

নোন্টু-দা বলিল, "আধ-মরা হয়ে।"

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। নোন্টু-দা গনশার দিকে চাহিয়া হাতজোড় করিরা বলিল, "মাফ করবেন, আমার কথাগুলো একটু

বাঁকা বাঁকা—নিবারণ-কাকা আধমরা হয়ে ছিলেন, এইবার আপনাদের আসবার খবর পেয়ে আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠবেন।”

সকলে আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। গেঁয়ো কাঠরসিকতায় ইহাদের সকলের পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল। গনশা বক্তার ন্যুব্জ দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল, “ক-ক্কথাগুনো বেঁকা হবে তা আর আশ্চয্যি কি বলুন? ভ-ভ্যয়ানক বেঁকা রাস্তা হয়ে বেরুচ্ছে কি না।”

সকলে হো-হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পাশে একজন সঙ্গীকে ফিসফিস করিয়া বলিল, শিবপুরের দল, চালাকি করতে গেছেন নোন্টু-দা!

কথাবার্তার মধ্যে ইহারা একটা গলি ঘুরিয়া একটা বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িল। পাশাপাশি চারিটা ঘর, সামনে একটা বারান্দা। বারান্দার একপাশে ইঁটের উনানে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছে। কাছেই দুইজন মুরুব্বিগোছের লোক বসিয়া গল্প করিতেছে, একজনের হাতে হুঁকা।

দলটি আসিতেই হুঁকা হাতে লোকটি ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, “এই যে, এসে গেছেন এঁরা, শিবপুর থেকে তো? ওই পাশের ঘরটায় নিয়ে যাও। দক্ষিণে কোথায় গেল?

জল দিক, চান-টান করে নিন্।...উঃ, দুপুর গড়িয়ে গেল। কি করে হল এত দেরী?”

রাজেন আগাইয়া একটা নমস্কার করিল, বলিল, “ইঞ্জিন বিগড়ে এই নিগ্রহ।”

গনশা, ঘোৎনা প্রভৃতি সকলে আসিয়া একে একে নমস্কার করিল। ভদ্রলোক একবার সকলের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, “সবাই এসে গেছেন আপনাদের?” চলুন, ওপরে আসুন। নোন্টুকে পাঠিয়েছিলাম স্টেশনে, সে কোথায় গেল?”

নোন্টু গনশার এক ঠাট্টাতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। একজন ছোকরা বলিল, “তিনি বললেন—তোরা বৃন্দাবন সামলা, আমি

মথুরা সামলাতে চল্লাম”—নিজেও হাসিয়া উঠিল এবং আর সকলেও যোগ দিল।

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, “বড্ড ফোচকে হয়েছে ওটা। নে, তোরাই তাহ’লে এঁদের দেখশোন একটু, যেন কোন কষ্ট না হয়। নিবারণদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।...নিন্‌, আপনারা চান-টান সেরে একমুঠো খেয়ে নিন্‌। ঠাকুর, তোমার মাংসের যদি দেরি থাকে তো সাদামাটা যা হয় একটু ব্যবস্থা করে দাও। এমনিই খুব দেরি হয়ে গেছে।”

মাংসে মসলা দিয়া নাড়িতেছে। গোরাচাঁদ হ্রস্ব নিঃশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ লইতেছিল, সাদামাটা ব্যবস্থার নামে শংকিত হইয়া একটু হাসিয়া বলিল, “করুক ধীরে সুস্থে, খাওয়াটাই তো আসল নয়।”

মাংসটা খুব ভাল রান্না হইয়াছিল, তায় মাথার উপর একটা অনিশ্চিত বিপদ ঝুলিতেছে, ইহারা মরিয়া হইয়া ফাঁসির খাওয়া খাইয়া লইল। গুরুভোজন, গাড়ির কষ্ট, শতরঞ্জির উপর বিছান সাদা ধপধপে ফরাস, চাপা গলায় নানারকম আন্দাজ-আলোচনা করিতে করিতে ইহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। ত্রিলোচন, গনশা আর রাজেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহারা দুইজনে মুখোমুখি হইয়া শুইয়া আছে, ত্রিলোচন উঠিয়া বসিয়া একটা বিড়ি টানিতেছে। রাজেন বলিল, “আমার আন্দাজ যদি মিথ্যে হয় গনশা তো কি বলেছি—এর মধ্যে ঠিক দৈব কোন ব্যাপার আছে, শুনলি তো? নিবারণবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।”

ত্রিলোচন বলিল, “সব বিয়েই তো আগাগোড়া দৈব।…বেলা পাঁচটার সময় আমার ফেলের খবর শুনে বাবা বললে, ‘ওকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।’ রাত ন’টার সময় বাবাতে আর পরে যিনি শ্বশুর হলেন তাতে—শংকর চাটুজ্যের ওখান থেকে খাওয়া-দাওয়া

করে এলেন—দু'জনেরই একটু একটু গোলাপী গোছের নেশা ধরে এসেছে। বাবা বললে, "সে ব্যাটাকে ত্যাজ্যি পুত্তুর করেছিলাম—বেরিয়ে যায় নি তো ?" মা বললে, "বালাই, তার শত্তুর বেরিয়ে যাক্, সে ওপরে ক্যারম খেলচে।"

"তখুনি ন্যায়রত্নমশাইকে ডাকা হ'ল, শ্বশুর নিজের হাতের আংটিটা খুলে আশীর্ব্বাদ করে গেল।"

"বিয়ে বাপের হাতেও নয়, জেলার জজের হাতেও নয়" বলিয়া ত্রিলোচন বিড়ি টানিতে লাগিল।

রাজেন বলিল, "আর কারুর মামা যদি ভাবে তার হাতে, তো তাও নয় !"

সকলে চুপ করিয়া রহিল একটু। শ্রুতিরোচক মন্তব্য শুনিয়া গনশার মনটা চাঙ্গা হইয়া উঠায় গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ধরিল। গানটা যখন বেশ একটু জোর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, ত্রিলোচনও সুটকেসটা টানিয়া তবলা শুরু করিয়া দিয়াছে, ঘোৎনা আসিয়া চৌকাঠের নিচে দাঁড়াইল—একবার পিছনে আশে পাশে দেখিয়া লইল, একটু চাপা গলায় গনশার টোন নকল করিয়া বলিল, "শুধু গানে হবে না, ঘুঙুর পর, না-ন্নাচও দেখাতে হবে।"

গনশা বোধ হয় 'তাও পারি' বলিয়া রসিকতা করিতে যাইতেছিল, ঘোৎনা গম্ভীরভাবে আসিয়া পাশে বসিল, বলিল, "তোমাদের বিয়ে-বরযাত্রীর স্বপ্ন দেখবার জন্যে ঘুম আসছে, শম্মার তা আসেনি। নেমে পর্যন্ত গা ছমছম করছিল আমার।...কেন বাবা, গরীবের ছেলে চাকরি খুঁজতে এসেছি, এত চব্যচুষ্যের ব্যবস্থা কিসের ! গতিক ভাল নয় তো ; ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছুবি তো পৌঁছো একেবারে খাস জায়গায়—বড়বাবুর বাড়িতে..."

রাজেন প্রশ্ন করিল, "দেখা হল ?"

ঘোৎনা ঝাঁঝিয়া বলিল, "চুপ কর্ রাজেন, তার মরবার ফুরসত নেই, একদিকে ভিয়েন, একদিকে থিয়েটারের স্টেজ, একদিকে বরযাত্রীদের হাঙ্গামা...."

"তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "বরযাত্রী !"

ঘোৎনা বলিল, "তার মেয়ের বিয়ে হলে বর-বরযাত্রী আসবে না তো একপাল পেটে-অন্ন-নেই চাকরির উমেদার আসবে ?... গুপ্তোরপাড়া থেকে বরযাত্রী এসেছে ; জনাই থেকে সখের থিয়েটার পার্টি—এলো বলে, এইখানেই উঠবে, মোটরে আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা, আর শিবপুর থেকে ওরিয়েণ্টাল ড্যান্স পার্টি......"

ত্রিলোচন উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, "এসেছে ?"

ঘোৎনা বলিল, "হ্যাঁ, এই যে গল্পগুজব করছে।"

সকলে মিনিট দুই স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

বড়বাবু দলের মধ্যে যে কোনটিকে বাছিয়া লইতে পারেন,—কে গুপ্ত ঘুমের ঘোরে বোধ হয় ক'নে এবং চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। ত্রিলোচন ঠেলা দিয়া বলিল, "কি পাস করেছি—পাস করেছি করছেন মশাই, উঠুন, যা চাকরি পেয়েছেন এখন সামলান।"

গোরাচাঁদকেও তোলা হইল। সব শুনিয়া দুজনে বাকরুদ্ধ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। ঘুমের ঘোর কাটিয়া কথাটা যখন মাথায় ঢুকিল, গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া বলিল, "আমায় ফেলে যাসনি, বড্ড খেয়েছি...."

ঘোৎনা বলিতে লাগিল, "এতক্ষণ দফা নিকেশ হয়েছিল। একপাল ছেলেছোকরা তোমাদের কাছে দু'একটা পা শিখে নেওয়ার জন্যে ঝুঁকেছিল, রাজেনের উদয়শংকরী ঝুঁটি আবার সর্বনাশ করেছে কি না—কর্তাদের বলে কয়ে এদিকে কাউকে ঘেঁষতে দিই নি এতক্ষণ। বললাম, 'গত চার রাত্রি থেকে সেরামপুর, দমদমা, রাণাঘাট আর মজিলপুরে বায়না খেটে সবাই আধমরা হয়ে রয়েছে, পা আর উঠছে না, একটু ঘুমুতে দিতে হবে ; তাই এদিকে ভিড় নেই, নইলে..."

গনশা বিরক্তি এবং সন্দেহের সহিত বলিল, "বা-ব্বাজে বকিসনি

ঘোৎনা, কি শুনতে কি শুনে এসে...একটা দলকে বায়না করে এসেছে, কেউ চিনলে না যে, আমরা তারা নয়?...গাঁ-গাঁজাখুরি ঝাড়তে এসেছিস...."

ঘোৎনা বলিল, "তাহলে তুমি বড়বাবুর হাতে দরখাস্ত দেওয়ার জন্যে থাক, আমাদের যেতে দাও—আর যাবেই বা কোথায়? ফেরবার গাড়ি নাস্তি।...যা বলছি শোন, ঘোৎনা অত কাঁচা ছেলে নয়, সে খোঁজও নিয়েছি। বায়না যে করে এসেছিল—সেই ব্যাটা নোন্নুর দাদা—এদের পান্নু-দা, সে এখনও ফেরেনি, চিনবে কে?—সে শিবপুরের দলকে রওয়ানা করে দিয়ে ওদিক থেকে জনাইয়ের দলকে মোটরে করে নিয়ে পৌঁছুবে—পৌঁছুল বলে।"

কে গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "তাহলে শিবপুরের দল—মানে ড্যান্সিং পার্টি এল না কেন?"

গোরাচাঁদের মুখ শুকাইয়া আমসি হইয়া গেছে। খিঁচাইয়া বলিল, "থামুন মশাই, আপনি আর বোকার মত যা-তা জিগেস করবেন না ওরকম করে; আসেনি আমাদের কপাল ভেঙেছে বলে ...তোরা তো পালাবি, আমার পেট ফুলচে..."

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। এদিকটা খালি ছিল; চায়ের কেটলি, পেয়ালা পরাতে করিয়া জলখাবার প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি লোক উপস্থিত হইল। জনাই থেকে যাহারা আসিতেছে তাহাদের ব্যবস্থা। এদের সঙ্গে নোন্নুদাকে কেন্দ্র করিয়া আবার ছেলেদের দলও আসিয়া জুটিল একটা। জায়গাটা সরগরম হইয়া উঠিল। নোন্নু বুকের উপর হাত দিয়া বলিল, "আবার আপনাদের বেঁকা-নোন্নু হাজির হয়েছে, চা'টার—চা এবং টার ব্যবস্থা করি একটু?"

ছেলেরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মেজাজটা আরও খারাপ,—গনশা একরকম রাগিয়াই কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় গোটাতিনেক মোটর হর্ণ দিয়া সামনের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। নোন্নু ঘুরিয়া দেখিয়া বলিল, "জনাই এসে গেছে!" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটা উচ্চহাস্য ও কলরবের সঙ্গে 'জনাই এসে গেছে,

জনাই এসে গেছে,' করিয়া হুড়মুড় করিয়া নামিয়া সেই দিকে ছুটিল।

রাজেন বলিল, "পান্নুদা এসে গেল, উপায় এখন? দাঁড়িয়ে চোরের মার খেতে হবে গনশা; কি করতে আসা, কি হতে চলল!" গোরাচাঁদের সবচেয়ে আশঙ্কা, তাহাকে ফেলিয়া সকলে পলাইবে; দাঁড়াইয়া মার খাওয়ার নামে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "ক' ঘা করে দেবে বলে তোর আন্দাজ হয় রাজেন?"

বেহালা, ক্লারিয়নেট, কর্নেট প্রভৃতির বাক্স হাতে করিয়া জনাইয়ের দল নামিয়া আসিল। প্রায় জন ষোল সতের। মোটরের শব্দ শুনিয়া কাজের বাড়ি থেকেও লোক আসিয়া জুটিয়াছে। আদর অভ্যর্থনার মধ্যে প্রশ্ন হইল, "আমাদের পান্নু কোথায়?…পান্নুকে দেখি না যে?…"

পাশের ঘর, বারান্দা সব ভরিয়া গেল—উঠান পর্যন্ত। "জল গরম কর, ..চা—চা…হাত-পা ধোবার জল দিক…"

রীতিমত একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। রাজেন চাপা গলায় বলিল, "এই বেলা গনশা, এই ভিড়ের মধ্যে…"

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোরাচাঁদ বলিল, "দৌড়ুতে পাবি না বলছি…তাহ'লে ফাঁস করে দোব…দেখ্ আমার পেটে টোকা মেরে, না বিশ্বাস হয়…"

কে উত্তর করিল, "পান্নুবাবু শিবপুরের ওরিয়েন্টাল ড্যান্স পার্টিদের নিয়ে পেছনে আসছেন—আর ট্যাক্সি তক্ষুণি পাওয়া গেল না ব'লে একটু আটকে গেলেন। বললেন…"

কয়েকটা কণ্ঠে অতিমাত্র বিস্মিত প্রশ্ন হইল, "শিবপুর! শিবপুরের তাঁরা তো…" কোণের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

সবাই কাঠ হইয়া গিয়াছে; এক গনশা ছাড়া। সে বেশ সহজভাবে বাহির হইয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "পা-প্পান্নুদা কতক্ষণে পৌঁছুবে তাদের নিয়ে?"

কয়েকজন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে…আপনারা?"

গনশা অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, "ক-কজন মাত্র এসেছি আমরা, ফার্স্ট ব্যাচে। রাজেনবাবু, ঐ বাবরি—স্নেক ড্যান্স দেবেন ; আমি ক্লারিয়নেট, ত্রিলোচন তবলা…"

একটু গা-ঢাকা অন্ধকার হইয়াছে, তাহা না হইলেই সকলেই দেখিত রাজেনের মুখটা একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। তাড়াতাড়ি গনশার কানের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "আমি এবার চেঁচাব গনশা, আমায় ফাঁসিয়ে দিলি,—ড্যানসিঙের 'ড'-ও জানি না..."

রাজেনের সঙ্গে সঙ্গে খাতির দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কয়েকজন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "উনি বলেন কি ?"

গনশা রাজেনকে একটা চুপ করিবার জন্য চিমটি কাটিয়া বলিল, "উনি বলছেন, নী-নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্সটা দেখাবেন আজ—ওইটেই ওঁর স-স্বচেয়ে ভাল কিনা—মা-মাস্টারপীস্।"

গোরাচাঁদ নিজের অনুকূলেও সবার একটা সহানুভূতি গড়িয়া লইবার জন্য আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমি একটা মণিপুরী ড্যান্স দোব।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলিল, "আপনার যেরকম কাঠামো মশাই, তাতে ভোজপুরী ড্যান্সেরই বেশি খোলতাই হত।"

একজন বয়স্থগোছের বলিল, "ও! আপনারা তাহ'লে সবাই আসেন নি ?"

গনশা বলিল, "আজ্ঞে না, কয়েকজন ছুটি পেলে না ; চাকরি আছে কিনা।"

"তা এ ব্যবস্থা মন্দ হয় নি,—পানু ওদের নিয়ে ঠিক সময়ে না আসতে পারলেও আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন।" ঘোৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ!…কত আসর মেরে এলাম, আর এ তো…একা রাজেনই..."

বাবরীওয়ালা নীলগিরি স্নেক্ ড্যান্স দিবার লোকটির পায়ের

দিকে কয়েকজনের নজর গেল, থর থর করিয়া এত কাঁপিতেছে—প্রায় হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে। সকলে ভাবিল—সাধা পা, নাচের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় মিনিট পনর-কুড়ি পরের কথা।

মোটর তিনখানা ভিড় থেকে সরিয়া গিয়া খানিকটা দূরে সারি সারি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘোৎনা, রাজেন প্রভৃতি ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া একে একে জড়ো হইল, সবশেষে গনশা একটু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমাদের মধ্যে মাখন ড্রাইভার কার নাম?"

মাঝের গাড়িটার ড্রাইভার সীটে হেলান দিয়া শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমি মাখন।"

গনশা গাড়ির দুয়ারটা খুলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "শীগ্‌গির স্টার্ট দাও, জ-জনাইয়ে ফিরে যেতে হবে। আসল জিনিসই সব ভুলে এসেছে।"

ঘোৎনা প্রভৃতির পানে চাহিয়া বলিল, "উঠে এস তোমরা, দে-দেরি কর'না আর, সব হাতে হাতে সংগ্রহ করে নিতে হবে।...কি যে ফ্যাসাদ করে বসল!"

গোরাচাঁদ বলিল, "ব্যাগটা রয়ে গেল..."

গনশার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। গোরাচাঁদের উপর একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল, "ও, তাওতো বটে; তা আপনি ওটা একটু দয়া করে আগলানগে, এক্ষুণি তো আসছিই ফিরে!...কই দিলে স্টার্ট?"

স্টার্ট দেওয়া হইয়াছে, গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ফুট-স্টেপের উপর লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, সুটকেস আর যাবে কোথায়? সব চেনাশোনা নিজের লোক..."

ওদিকে কে হাঁকাহাঁকি করিতেছে—"কৈ, শিবপুরের এঁরা সবাই

গেলেন কোথায়?—মণিপুরী ড্যান্সের সেই ভদ্রলোক যে চা-জলখাবার নিয়ে আসতে বললেন?…”

দ্রুত অপসৃয়মান মোটরের মধ্যে গোরাচাঁদের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কয়েকজনের দাঁত কড়মড়ানির শব্দ হইল।

শব্দরূপ

"লতা—লতে—লতাঃ, লতা—লতে—লতাঃ—"

রাস্তার ওধারে ঐ ওদের বাড়ির ছেলেটি জোরগলায় শব্দরূপ মুখস্ত করিতেছে। সেকেণ্ড কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে এইরকম শুনিয়াছি।

রাত এগারটা ; আহারাদি সারিয়া পান চিবানোর সঙ্গে ধূম্র-সেবন চলিতেছে, পাশে শুভ্র পরিচ্ছন্ন বিছানাটি, ইচ্ছা হইলেই গিয়া শুইব, সে ইচ্ছার মধ্যে বাহিরের অন্য কাহারও অধিকার উপদ্রব নাই, সেটা মাত্র আমার স্বরাট্ মনের খেয়ালখুশি।

—এ-ই তো জীবন!—মুক্ত, আত্মসম্পূর্ণ—

ছেলেটির উপর মনটা করুণায় ভরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের চিত্র সব যেন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।—

সকালবেলায় ওঠা।—অবশ্য এখনও উঠি, কিন্তু তাহা চাই বলিয়াই উঠি, সকালটা মিষ্ট লাগে বলিয়াই উঠি।

তখন মিষ্ট লাগিত বিছানা আর তাহার বিচ্ছেদটি সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সমস্ত সময়টিকে তিক্ত করিয়া রাখিত। কিন্তু সে কথা কে বোঝে? জীবনেরও অংশটার বর্তমান নাই, শুধু ভবিষ্যৎ আছে ; আর সেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য মায়ের চোখ পর্যন্ত সতর্ক, নিষ্করুণ ; অন্যে পরে কা কথা?

মায়ের প্রথম সম্ভাষণ, " না, এ ছেলের যদি কিছু হয়! মাস্টার এসে গেল, এখনও তোর ঘুমের ঘোর কাটল না?—চোখ কচ্‌লাচ্ছিস? নাঃ—"

নেপথ্যে কাকার তাগাদা, "উঠল বৌদি, তোমার আদুরে গোপাল? খুব আস্কারা দাও, ভবিষ্যৎটি চিবিয়ে খাও ছেলের—"

একটু পরে দাদা তাগাদায় আসিয়া উঠানে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। কোন রকমে বাক্‌স্ফূর্তি হইলে আঙুল গুণিয়া বলিলেন, "প্রথম নম্বর তো শয্যাত্যাগই বাবুর একটা পর্ব, তারপর তোড়জোড় ক'রে মুখ ধোওয়ার ঘটা—যতটা সময় যায়; তারপর হ্যান, ত্যান, সাত সতরো—"

গণনাটা অনির্দিষ্ট 'হ্যান ত্যান'র জোরে আটের কোঠা পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, "এখন আবার ঐ এক কাঁড়ি কোলের কাছে নিয়ে বসেছ তো? খাও, কিন্তু ও ঘুঘনি খাওয়া হচ্ছে না শৈলেন, নিজের ভবিষ্যৎ খাওয়া হচ্ছে, শর্মা এই বলে রাখলে।"

ঘুঘনি গলা দিয়া আর গেল না, তাড়াতাড়ি হাতমুখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া গিয়াছি। জীবন মাস্টারমহাশয় এই দিকেই চাহিয়া বসিয়া আছেন, দেখিয়াই একপ্রকার ভেংচানো আপ্যায়নের সঙ্গে হাত দুইটা একটু বাড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আ-সুন, আসুন, আস্ত্যাজ্ঞে হোক! দেড়টি ঘণ্টা বসে আছি বাপু—পড়াশোনা তোমার কর্ম নয়, কেন এলে? যাও, মা, ভাই, কাকা, জেঠার আদর খাওগে। কালকের অঙ্কটা হয়েছিল?"

সৌভাগ্যক্রমে কঠিন অধ্যবসায়ের জোরে অঙ্কটা হইয়াছিল। জীবন মাস্টারমহাশয়কে খুশি করিতে পারিব বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, ক'রে তবে ছেড়েছিলাম মাস্টারমশাই, রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত—"

"রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত! অসাধ্যসাধন করেছ যে! নেপোলিয়ান না হয়ে ছাড়ছ না দেখছি!" (অতঃপর বিকৃত মুখে) —"বলি, সারা বছরটা সাতটা না হতেই বিছানায় ঢুকে একটা দিন যদি একটু রাত ক'রেই শুয়ে থাক তো বড় গলা ক'রে আবার সেটা জানাচ্ছ কি? লজ্জা করে না?"

অধ্যবসায়েরও পুরস্কার এই, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল—জীবন মাস্টারের পড়ানোর এই নমুনা,—

তামাক খাইতেন, সে যুগের ঢাউস 'বসুমতী' পড়িতেন, বাকি সময়টা ভালমন্দ নির্বিশেষে বাক্যযন্ত্রণা দিতেন। শ্লেষবাক্যে অমন সাধা রসনা এ পর্যন্ত আর কাহারও দেখি নাই।

বাড়ির গণ্ডি পার হইলে স্কুলে ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি তাহা এই যে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত অকুণ্ঠভাবে ঠেঙাইতেন। প্রোপ্রাইটার, হেডমাস্টার উভয়েই তাঁহার ছাত্র, এই পদ্ধতিতে গড়া; তাঁহারা মৃদু আপত্তি করিলে বলিতেন, "কেন, এরাই বা কি দোষ করেছে ?"

না, জীবনটা যে নিতান্ত এইরকম একঘেয়েই ছিল—এটা বলাও ভুল হইবে।—বৈদ্যবাটি স্কুলের টীম ম্যাচ খেলিতে আসিল। ভলাণ্টিয়ারের ব্যাজ বুকে লটকাইয়া সে কী ফূর্তি সমস্তটা দিন! স্টেশন থেকে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা; আতিথ্যের তদারক, ঘোরাফেরা, মোড়লি করা; বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, স্কুলের সম্পর্কও একেবারে অন্যবিধ। হেডমাস্টার বলিতেছেন, "দেখো শৈলেন, সারাটা স্কুলের মানমর্যাদা আজ তোমার ওপর নির্ভর করবে—সেবায়, সম্বর্ধনায়, ডিসিপ্লিন্ রক্ষায় কোন রকমে যেন অপযশ না হয়, দেখো !"

হউক একদিনের জন্য, কিন্তু সেই একদিন ধরিয়াই জীবনের কি প্রসার! কি বেপরোয়া ভাব!—সেই দিনই সিগারেটে হাতেখড়ি!

পরের দিন ফার্স্ট পিরিয়েডেই সেকেণ্ড মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়া বোর্ডে দাগড়া দাগড়া অক্ষরে লিখিলেন, "রাইট্ অ্যান এসে অন্ ফুটবল ম্যাচ। দশখানি পাতা ভরে লিখবে সব, কাল নিশ্চয় মন দিয়ে খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছ সবাই—টীমের গাড়ি থেকে নামা থেকে শেষ পর্যন্ত।—শুনছো তো শৈলেন ? হুঁ, তুমি আবার বেশি মুড়লি করছিলে দেখলাম, একটি পাতা কম হলে মুড়ুলি ঘুচুব তোমার।"

যাঁহারা শখ করিয়া মধুর বাল্যে, মধুর কৈশোরে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের মানা করি না, তবে আমি তাঁহাদের দলে নাই।

শব্দরূপের গগনভেদী শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, "তৃতীয়া—লতয়া, লতাভ্যাম্, লতাভিঃ।"

আমাকে মুখস্থ করিতে হইতেছে না, তবু, কি জানি কেন শুধু শোনার জন্যই যেন পরিশ্রান্ত হইয়া আসিতেছি। কানে য-ফলা আর অনুস্বার যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। যে মুখস্থ করিতেছে সে বেশ উৎসাহের সহিতই মুখস্থ করিতেছে—কাল পণ্ডিতমহাশয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিবে নিশ্চয় এই উচ্চাশায়। আমার কিন্তু এদিকে অমন মধুর অম্বুরির ধোঁয়া তিক্ত হইয়া আসিতেছে, সামনের জোৎস্নাদীপ্ত আকাশের নীলাভা মলিন হইয়া আসিতেছে। কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যাইতেছে সেই ছেলেবেলার এক দিনের কথা—রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত অঙ্ক কষার ইতিহাস—তার পরিণাম—তার পুরস্কার।

অথচ বুঝি, এটা আমার উচিত নয়, এমন কি অধর্ম, কেননা আমি একজন প্রফেসার। পাড়ার ঘরে ঘরেই যদি কিশোর কণ্ঠে শব্দ সাধনার রোল উঠে তো আমার প্রফেসারি-কর্ণে সেই সংগীত ঝংকার হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু—

আমার ছোট ভগ্নী আসিয়া উপস্থিত হইল। না, এগারটা উহার শয্যা আশ্রয়ের সময় নয়। অনেক কাজ ওর; সবচেয়ে বড় কাজ বাড়ির গেজেটগিরি। ভোর ছয়টা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত তাহার গতিবিধির গণ্ডীর মধ্যে যাহা ঘটে অক্লান্ত উৎসাহে সে সমস্তর সংবাদ চারিদিকে চারাইয়া দেওয়া সুধী'র নিত্যকর্ম। আমি উহাকে নিরুৎসাহ করি না, কেননা কোন ঘটনা কিংবা কোন আলোচনা ও এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতেছে যে সংকল্প করিয়া আছি উহাকে একটি সাহিত্যিক করিয়া গড়িয়া তুলিব। শুধু অনুরূপ বর্ণনা বা আবৃত্তিই নয়, ওর স্বকীয় মন্তব্য বলিয়াও একটা জিনিস আছে, আর সেটা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই নির্ভীক।

বসিয়া আমার আরাম-কেদারার হাতলে চিবুক রাখিয়া সুধী বলিল, "মেজদা, তোমার লজ্জায় আর মুখ দেখানো উচিত নয়।"

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন রে ?"

সুধী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল, "কেন রে, কি ? পড়াশোনার ক্ষতি হবে ব'লে বিয়ে করলে না, কিন্তু কি জজ ম্যাজিস্ট্রেটটাই বা হ'লে ? হ'লে তো শেষ পর্যন্ত সেই মাস্টার—গোবর্ধন মাস্টারও যা তুমিও তাই, তুমি না হয় টাই এঁটে টুপি প'রে গরু তাড়াতে যাও।"

বুঝিলাম সুধী'র নিজের কথা নয়, আবৃত্তি ; নিচে মা প্রভৃতির মধ্যে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, সুধী সেইটেই রাতদুপুরে আমার শ্রুতিগোচর করিতে আসিয়াছে। বলিলাম, "বিয়ে করলে যে একটুও হত না, হদ্দ তোর না হয় আর একটা বৌদি—"

সুধী মাথা ঝাঁকাইয়া রাগতভাবে বলিল, "না, হত না। কারুর হয় না। বিয়ে করে সব্বাই বইখাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে পৈতে পুড়িয়ে ভগবানচন্দ্র হয়ে বসে থাকে। তুমি এই রাতদুপুরে আর বকিও না মেজদা। তোমার বরং ওদের বাড়ির ঐ ছেলেটির দেখে শেখা উচিত,—ওর চন্নামৃত খাওয়া উচিত।"

অবশ্য 'চন্নামৃত' কথাটার অর্থ সুধী জানে না বলিয়াই বলিল, তবে কথাটা কাহারও মুখে উঠিয়াছে নিশ্চয়। যাহার চরণোদকের এতটা প্রভাব সেই দেব-বালকটি কে জানিবার জন্য সুধীকে প্রশ্ন করিলাম, "কোন্ ছেলের কথা বলছিস তুই ?"

"কেন, ঐ যে পড়ছে, শুনতে পাচ্ছ না ? মাসখানেক আগে পর্যন্ত ও-ছেলে যা ছিল, বাবা, বাবাঃ ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে কেবল এপাড়া, ওপাড়া, সেপাড়া করে ডানপিটেগিরি ক'রে বেড়াত—বই-সেলেটের সঙ্গে দেখা নেই। বাপমায়ে স্কুলে টাকা গুণে যাচ্ছে, ছেলে সেই একভাব—সেই যে সেকেনকেলাসে এসে আটকেছেন, আর নড়নচড়ন নেই—তা বয়েস মানবে কেন গা ? দিন দিন মাথায় লম্বা হচ্ছেন আর কাটগোঁয়ারের মত চেহারা হচ্ছে। একবার তো পালিয়ে গিয়ে পশুপতিনাথই হয়ে এল ..আবার এদিকে ভক্তিটুকুন আছে কি না! এমন সময় একদিন গিন্নীর বোন এলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলেটির মাসী ?"

"ছেলের মাসী !" অবাক্ হয়ে বললেন, 'দেখছিস কি সরী, শীগ্‌গির ছেলের বিয়ে দে, ছেলে যে দামড়া মেরে যাচ্ছে, এর পরে আর কি সামলাবে ? দে দিকিন বিয়ে, যদি ছেলের মতিগতি না ফেরে তো আমার নাম লক্ষ্মী বামনী নয় ।' গিন্নী বললেন, 'দাও একটু কিছু ক'রে দিদি, আমি তো পাড়ার নালিশে নালিশে উদ্বাস্ত হয়ে গেছি। বললেই বলে 'আমি রোঘো ডাকাত হব ; বড়দের লুটব, ছোটদের পুষব !' গিন্নীর বোন উঠে প'ড়ে লাগলেন, বিয়ে হয়ে গেল। দেশেই বৌভাত সেরে আজ এসেছে সব। আর সে ছেলেই নেই।......কর বিয়ে মেজদা, এখনও কাল ব'য়ে যায় নি।"

ওদিকে ঐ কঠোর সাধনা চলিতেছে, "ষষ্ঠীতে—লতায়াঃ-লতয়োঃ-লতানাম্, ষষ্ঠীতে লতায়াঃ—

একেবারে অভাবনীয় পরিবর্তন ! এত পরিশ্রম দেখিয়া গায়ে কাঁটা আসিলেও বিবাহের উপর একটা শ্রদ্ধা আসে বইকি।

সুধী বলিয়া চলিয়াছে, "আমরা আজ গিয়েছিলাম কিনা, এই তো আসছি সেখান থেকে।...কি ফুটফুটে বৌটি, মেজদা ! বেশ ডাগোর-ডোগোর, আর কথাবার্তায় কি সেয়ানা ! আমার সঙ্গে তো খুব ভাব হয়ে গেল।...আহা, যদি ঐ রকম একটি—"

আমি ধমক দিতে চুপ করিয়া গেল। তখনই আবার পূর্ব উৎসাহে আরম্ভ করিয়া দিল, "খু—ব ভাব হয়ে গেল আমার সঙ্গে। নামটিও বড় চমৎকার—"

একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা যেন ভাবিতেছিলাম, বোধ হয় দেশের ভাবী রঘু ডাকাতের কথা,—তারা সব এই রকম বিবাহ করিয়া ভাল ছেলে হইয়া যদি এই ভাবে ব্যাকরণ সাধনায় মাতিয়া উঠে তো—

সুধীর কথায় অলস প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি নামটি ?"

"বনলতা।"

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া কথাটা আবছাগোছের কানে গেল। সতর্ক হইয়া চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, "কি নাম বললি ?"

"বনলতা গো।...ছেলেটা যাই হোক বড় ম্যাদামারা কিন্তু বাপু; সেই থেকে এক কথা নিয়ে ব'কেই চলেছে।...তা হবেই বা না কেন বল? এদিকে তো পড়াশোনার পাটই তুলে দিয়েছিল কিনা! গিন্নী বলেন, 'কি ঝোঁকই পড়ার হয়েছে, দিদি;—বৌমা যাবেন, তখন গিয়ে বাধ্য হয়ে বই বন্ধ করবে; বৌমার আবার কড়া আলো চোখে সয় না কি না!'"

এই কঠোর সাধনার গোড়ার রহস্য জানিতে পারিয়া আমার এতক্ষণের দুঃখ-দুশ্চিন্তা আলোড়ন করিয়া বোধ হয় একটা সকৌতুক হাসি ঠেলিয়া উঠিয়া থাকিবে। সেটা বিবাহের গুণগানের এবং সদ্দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ সুফল জানিয়া সুধী আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল, "বলব তাহ'লে মাকে মেজদা, যে তুমি রাজী হয়েছ ?"

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌটির এত দেরি হচ্ছে কেন বলতো আগে ?"

সুধী বলিল, "আমরা যখন এলাম তখন তো মোটে খেতে বসল সব। সবে এসেছে আজ···সবই অগোছ ছিল কিনা!···বলব গিয়ে মাকে ?—হ্যাঁ মেজদা ?"

ওদিকে তখন ক্লান্ত স্বরের মূর্ছিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, "সম্বোধনে...হে লতে; সম্বোধনে—হে লতে—হে লতে—হে লতে—"

ধর্মতলা-টু-কলেজ স্কোয়ার

ধর্মতলার মোড়ে ট্রামে উঠিলাম, "—চিঠি"র অফিসে যাইতে হইবে।

একটু অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় রব উঠিল, "এই বাঁধো, বাঁধো...লেডি!"

"একদমসে বাঁধ করকে; স্ত্রীলোক উঠতা হ্যায়!"

ঘুরিয়া দেখিলাম একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক মন্দগতি ট্রামের পাশে পাশে পা চালাইয়া অগ্রসর হইতেছে। রড্‌টা ধরিবার জন্য ডান হাতটা উঁচু করা। উঠিবার উপক্রম করিতেছে, কিন্তু উপযুক্ত সাহস সঞ্চিত না হওয়ায় একেবারে থামিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

আমার পাশের বেঞ্চে অত্যন্ত মোটা কাঁচের চশমা-পরা একটি প্রবীণ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। হাতপাঁচেকের পরেই সব ঝাপসা দেখেন বলিয়া বোধ হইল, এবং সেই জন্য হাতপাঁচেকের বাহিরে চারিদিকেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রহিয়াছে মনে করিয়া খুব সতর্ক। একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া একটু রাগতভাবে ড্রাইভারকে বলিলেন, "এই, ডেডস্টপ করো। লেডি উঠতা হ্যায়, শুনতা হ্যায় নেহি?"

হাসি পাইল, লেডিই বটে!

তুলতুলে মেয়েলী ঢঙের চেহারা। ফাঁপা চাদর, সিল্কের পাঞ্জাবি আর লটপটে কাপড়েও অনুরূপ ভাব! সলজ্জ এবং সংকুচিত—এই ট্রাম সম্পর্কিত ব্যাপারে লজ্জা-সংকোচে যেন আরও লুটাইয়া গিয়াছে। ট্রামটা নিশ্চলভাবে থামিয়া গেলে উঠিয়া কয়েকজনের দিকে চকিতভাবে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

একটি মেয়ে ট্রামের পিছনের বারান্দাটিতে একটা রড ধরিয়া

দাঁড়াইয়াছিল। যুবক উঠিতেই নিম্নস্বরে বলিল, "চল, সামনের সীটটায় গিয়ে বসি, খালি আছে।"

এতক্ষণে ভুলটা বুঝিতে পারিলাম, এই তাহা হইলে 'লেডি।'

কালোর উপর বেশ সুশ্রী। একটা টক্‌টকে লাল শাড়ি পরা। পায়ে অল্প একটু উঁচু-গোড়ালির জুতা, হাতে একটি খর্বাকৃতি ছাতা। সঙ্গীর অবস্থায় একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তবুও ভাবটা বেশ সপ্রতিভ।

দুইজনে একটু অগ্রসর হইল।

যুবক বলিল, "তুমি এই লেডিজ সীটেই বস না। আমি বরং ওখানটায় গিয়ে বসছি।"

অর্থাৎ গা-ঝাড়া দিতে চায় ও। ভিড়ের মধ্যে মেয়েটির সান্নিধ্যে যে কুণ্ঠা তাহা কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। মেয়েটি নিশ্চয় তাহাকে চেনে, বেশ একটু দৃঢ়তার স্বরে বলিল, "আচ্ছা, এস তো তুমি!"

আমার সামনে একটি বেঞ্চ খালি ছিল; সেইটিতে গিয়া দুই-জনে বসিল। একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর মেয়েটি মাথা নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার এমন হাসি পাচ্ছে!"

যুবক কারণটা যে বুঝে নাই এমন নয়, তবু জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

মেয়েটা ঘুরিয়া একবার পিছনে চাহিল। আমি একটা খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, সেটা সঙ্গে সঙ্গেই তুলিয়া ধরিতে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। নিজের পড়া লইয়া আছি ভাবিয়া নিশ্চিন্তস্বরে কহিল, "কেন আবার!—তোমার কাণ্ড দেখে! সবাই 'লেডি হ্যায়—বাঁধকে, লেডি হ্যায়—বাঁধকে' করছে, লেডির সাহস হচ্ছে না যে টপ ক'রে উঠে পড়বেন। আগেভাগে উঠে প'ড়ে এমন লজ্জা করছিল আমার। তোমায় ঠাট্টা ক'রে সব লেডি বলছে, কি আমায় ইঙ্গিতে টম-বয় বলছে!......এমন জ্বালায়ও পড়ে মানুষে।"

একটু তরল হাসি উঠিল।

উত্তর হইল, "গেলে কেন উঠতে না থামতেই ?"

"অপরাধ হয়েছিল। লেডি সঙ্গিনীকে আগে তুলে দেওয়া উচিত ছিল বটে।"

আর একটু হাসি ছলছল করিয়া উঠিল। তাহার পর—

"আজকে কেমন আমার অনেকদিন পরে স্কুলের খেলাধূলো, ড্রিল, স্কিপিঙের কথা মনে প'ড়ে গেল, বাপু! অতশত ভাববার আগেই টুপ ক'রে কখন উঠে পড়লাম। আর ট্রামটা তখন মোটে চলতে আরম্ভ করেছে। তবু কি ভাবলে লোকে কে জানে!... ভাবুক গে! ব'য়ে গেল।"

"আঃ, সবাই শুনতে পাবে; কি করছ ?"

"সাহেব মেম আর কি বুঝবে ?"

ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন হইল, "আর পেছনে ?"

ফিসফিস করিয়া উত্তর হইল, "হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করেছে—দু' ইঞ্চি টাইপের বোল্ড্ হেডলাইন।—উনি এখন জার্মেনিতে: সেখান থেকে ধর্মতলার কথাবার্তা শোনা যায় না।"

হাসির ছলছলানি একটু লাগিয়াই আছে।

যুবক একবার নিশ্চয় ঘুরিয়া দেখিল। সত্যই কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া থাকিবে, বলিল, "না, শোনা যায় না। বরং—

মেয়েটি প্রশ্ন করিল, "বরং কি, ব'লেই ফেল না। কেউ আমাদের আলাপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। আর ঘামালেও শুনতেই পাবে বড়। পুরনো ট্রামের এই একটা মস্ত সুবিধে। এটার আবার কোথায় কি একটা ঢিলে হয়ে গেছে।"

"বলছিলাম—বরং কাছে সুন্দরী ব'সে থাকলে হিটলারের বিজয়ের কথাই অতি সামান্য বলে মনে হয়।"

"কালো আবার সুন্দরী।"

"সুন্দরী আবার কালো!"

এবার তাহার একলার হাসি নয়, তুইটি স্বরের মিশ্র হাসি উঠিল, অবশ্য চাপা,—যুবকটির বেশি চাপা।

একটু নীরব। আবার হিটলারে মনঃসংযোগ করিব, প্রশ্ন হইল, ' আচ্ছা, আমি কাছে রয়েছি ব'লে তুমি অমন গুটিসুটি মেরে রয়েছ কেন বল দিকিন ? যেন ভয়ে সারা। আমি প্রথমেই বলেছিলাম ... তোমার কর্ম নয়। ল' কলেজের ফার্স্ট বয় হ'লেই হয় না, বড্ড মর‍্যাল কারেজের অভাব তোমার। আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি বলেই কাউকে গ্রাহ্য করি না। পাশে যখন নিজের—"

এই সময় ট্রামটা দাঁড়াইয়া পড়ায় বাক্যটা অসমাপ্ত রহিল।

আমাদের সামনে এই সময় কয়েকটা সীট খালি হইল। একটি ইংরেজ যুবক আসিয়া একটাতে বসিতে যাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের যুবক-দম্পতির সামনের সীটে উপবিষ্ট সাহেবটির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যালো জোন্স্, তুমি এখানে! জামালপুর থেকে কবে এলে ?"

জোন্স্ করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "পরশু এসেছি। তোমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। তোমার ঠিকানা কোন মতেই যোগাড় করতে পারলাম না, খবর দিতে পারি নি, মার্জনা ক'র।"

আগন্তুক বন্ধুপত্নীর সহিত করমর্দন করিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিল। ওদের একেবারে সামনের তুটো সীট—তিনজনের কথাবার্তা জমিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ট্রাম ছাড়িয়া আওয়াজটা বাড়িয়াছে। মেয়েটি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, যাচ্ছ তো আমায় নিয়ে ওভারটুন হলের মীটিঙে—ধর, যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, এই রকম ভাবে ইন্‌ট্রোডিউস করে দিতে পারবে ?"

যুবকটি শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়, এ আর কি শক্ত ?"

"কি বলবে ?"

"বলব—"

কণ্ডাক্টার আসিয়া দাঁড়াইল। আমি মাসিক টিকিট তুলিয়া

ধরিলাম। যুবকটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গটা মন্দ লাগিতেছিল না। আমি কাগজের উপর দিয়া দেখিতে লাগিলাম কত দূরের দৌড়। যুবক একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর একটা আট-আনি বাহির করিয়া বলিল, "শ্যামবাজার।"

মেয়েটি একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, "সেকি? কলেজ-স্কোয়ারে নামবে না?"

যুবক একটু অপ্রতিভভাবে দুর্বল কণ্ঠে বলিল, "শ্যামবাজারেই চল না।"

"বাঃ রে! মীটিং কলেজ স্ট্রীটে, ওভারটুন হলে, আর যাবে শ্যামবাজারে?"

আরও দুর্বল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে উত্তর হইল, "আঃ, আস্তে!"

কণ্ডাক্টার একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "কোথাকার দোব ঠিক করে ফেলুন।"

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কলেজ-স্কোয়ার?"

কাগজের উপর হইতে দেখিলাম—মেয়েটি একবার সঙ্গীর দিকে চাহিল। মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মেয়েটি কণ্ডাক্টারের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, শ্যামবাজার।"

স্বর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেছে। ট্রাম তখন মোড় ফিরিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটে প্রবেশ করিতেছে। টিকিট লওয়ার পর মেয়েটি ঘুরিয়া পার্কের দিকে মুখ করিয়া বসিল।

বুঝিলাম—রসভঙ্গ হইয়াছে, এবার নিঃঝুমের পালা চলিবে। কাগজগুলা ঠিক করিয়া লইয়া আবার হিটলার অভিযানে মনোনিবেশ করিয়াছি, এমন সময় জার্মেনি থেকে শুনিলাম—গাঢ়, অনুতপ্ত, ভাবাকুল স্বরে অনুযোগ হইতেছে, "রাগ করেছ?"

স্বর লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—মুখটাও রোষান্বিতার ঘাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, নিতান্ত যদি ঘাড়ে নাই পড়িয়া থাকে। একটু শঙ্কিত হইলাম, ছেলেমানুষদের কাণ্ড, ট্রামের মধ্যেই

জ্ঞান হারাইয়া কিছু একটা করিয়া না বসে। একটু গলা খাঁকারি দিলাম।

কিন্তু আমাকে যাহারা জার্মান প্রবাসের অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা নিজেই এখন শুধু অন্য দেশে নয়, একেবারে অন্য লোকে. কোন ফল হইল না।

"শুনছ? রাগ হ'ল নাকি?"

একটু চুপচাপ। আবার—

"কেন যে শ্যামবাজারের টিকিট করতে চাইছিলাম, একবার তো জিগ্যেসও করলে না।...রাগ!"

"বুঝতে পেরেছি; জিগ্যেস করার প্রয়োজন নেই। ওভারটুন হলে যদি আবার কারুর কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় সেই ভয়ে।"

"যে পরিচয়ে গর্ব, তাতে ভয়?"

"থামো, খুব গর্ব! গর্ব না লজ্জা—কালো নিয়ে; তাই তো এড়িয়ে যাচ্ছ।"

আরও চাপা গদগদ স্বরে উত্তর হইল, "আমার কালোর কাছে কোন ফরসা দাঁড়াত একবার দেখতাম—"

"ওঃ! তা কেন শ্যামবাজারের টিকিট করা হচ্ছে শুনি?"

স্বর পরিবর্তন হইয়াছে, কঠিন বরফে তরলতা আসিয়াছে একটু। যাক, ল' কলেজের ফার্স্ট বয়, বাঙালী যুবক, সে চলতি ট্রামে উঠিতে না পারুক, কথায় যে মন ভিজাইতে পারিয়াছে, ইহাতে আশান্বিত হইলাম; ঐ করিয়াই তো খাইবে। প্র্যাক্‌টিসও হইতেছে জজ সাহেবের চেয়ে কড়া এজলাসেই। আহা, ভাল!

যুবক সেই রকম গাঢ়স্বরে বলিল, "বলব?"

"শুনিই না!"

"আজ মীটিং-ফিটিং ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে, দু'জনে সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজকের দিনটা কাটাই। কতটুকুই বা পাই তোমায় নন্দা?"

কথাটা নিশ্চয় অন্য তরফেরও মর্ম স্পর্শ করিল। কোন

উত্তর হইল না খানিকক্ষণ। আবার আপিল হইল, "কি মত তোমার ?"

"আমার আবার আলাদা মত আছে নাকি ? তা কোথায় কাটাবে ? সিনেমা ?"

"সিনেমায় কি পরস্পরকে পাওয়া যায় নতু ? এদিকে কায়ার ভিড় ওদিকে ছায়ার ভিড়—বাস্তবে অবাস্তবে ওখানে অনুভূতিটাকে আধখেঁচড়া করে দেয়।—তুমি থাকবে পাশে অথচ সে কথা ভুলে এক অলীক ছায়ালোকে তোমার পেছনে ঘুরব, কখন নাগাল পাব না। আমি তোমায় চাইছি, পেয়েওছি, অথচ বিরহী যক্ষের মত—"

ট্রাম বউবাজারের মোড়ে দাঁড়াইল। একটু উঠানামা চলিল, পুরাতনের স্থলে নূতনেরা আসিয়া বসিল। বিশ্রম্ভালাপ একটু স্থগিত রহিল। আমি অস্ট্রিয়া অভিযানের আর একটা প্যারাগ্রাফ শেষ করিলাম। সামনে সাহেব-দম্পতির পরিত্যক্ত সীটে একটি বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। মেয়েটি অতি সাধারণ ঔৎসুক্যের কণ্ঠে কতকটা জোরেই যুবককে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, এপ্রিল থেকে শুনছি আমাদের ই-আই-আর-এর টাইম অনেক চেঞ্জ করবে, সত্যি নাকি ?"

অর্থাৎ এই ধরনের কথাই এতক্ষণ হইতেছিল এবং পরেও হইবে; প্রতিবেশী আমাদের অযথা ঔৎসুক্যের প্রয়োজন নাই। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার লোপ সুখের না হইলেও আমায় কাগজের আড়ালে হাসিতে হইল। এরা আমাদের ভাবে কি ? অথবা আমরাও বোধ হয় এককালে এই করিয়াছি. সবাইকে এই রকমই ভাবিয়াছি...আজ আর মনে নাই। ট্রাম চলিয়া আবার শব্দ আরম্ভ হইল।

যুবক আবার নিম্নকণ্ঠে বলিল, "এই ধর 'দেশবন্ধু পার্ক' কিংবা আরও দূরে দমদম এরোড্রোমের দিকে, কিংবা—"

মেয়েটি উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "চল, সত্যি চল। দমদমাই ভাল। না, আর দ্বিধায় কাজ নেই।"

"আঃ, আস্তে।"

"বাবাঃ, ভয়েই সারা!"

"বলছ তো যেতে, কিন্তু হবার উপায় নেই যে!"

শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর হইল, "কেন?"

"ওভারটুন হলের সামনে যতীন আর তিমির দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছে—তোমায় অভ্যর্থনা করবে।"

একটু চুপচাপ গেল। এদিকে অভ্যর্থনা, ওদিকে দমদমা। তাহার পর মেয়েটি মীমাংসার স্বরে বলিল, "না, দমদমা যেতেই হবে কোন রকমে।"

"তারা যে প্রত্যেক ট্রাম লক্ষ্য করবে সুনু, দেখলেই টেনে নামাবে।"

একটু আবদারের সুরে উত্তর হইল, "আমি কিছু শুনব না—আমার মীটিং-ফিটিং একেবারে ভাল লাগছে না। বিয়ের আগে ওসব হুড়ুদ্দুম-করে বেড়ানো শোভা পেত! আর এখন—"

"এখন দমদমায় গিয়ে উড়ে বেড়ানো!"

"ঠাট্টা রাখ"।—বুঝিলাম মুখ আবার অন্যদিকে ফিরিয়াছে!

বিমুখভাবেই উত্তর হইল, "আরে বাবা-মা ভাগলপুর থেকে ফিরলেই বলব, তাঁরা নেই দেখে আমায় ভুজুংভাজুং দিয়ে মীটিঙে একপাল লোকের মধ্যে নিয়ে গিয়ে—"

স্ত্রীয়াশ্চরিত্র! ভদ্রসন্তানকে তো বড়ই ফাঁফরে ফেলিল মেয়েটা! কিন্তু আমার হাতে তো কোন রকম উপায় ছিল না, থাকলেই বা ট্রামের এই ক্ষণরচিত অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ কোথায়? অধিকারই বা কি? চুপ করিয়া বসিয়া ঘটনা কি ভাবে বিকশিত হয় তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

"শানু!"

ঐ যুবক ঐ মেয়েটিকেই ডাকিল। এরই মধ্যে 'নন্দা', 'নন্থু', 'সুনু' আবার এই 'শানু'। টুকরা এই পাপড়িগুলির মূলপুষ্প কি—সুনন্দা? যাই হোক, বড় বেদনা বোধ হইতেছিল। নামের প্রতি অক্ষরের মধ্যে যে এতটা মধু পাইয়াছে, তাহার এই বঞ্চনা!

কোন উত্তর নাই। প্রশ্ন হইল, "কিন্তু এ অবস্থায় করাই বা যায় কি বল না! যা বলবে তাই করা যাবে না হয়।"

সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "দমদমা।"

"কিন্তু কি ক'রে হবে? তারা পথ আগলে রয়েছে যে।"

"এপথ ছেড়ে দাও!"

ঘুরে? বৌবাজার দিয়ে?"

একটু থামিয়া আবার করুণকণ্ঠে, "কিন্তু কণ্ডাক্‌টারটা জানে আমরা শ্যামবাজারের টিকিট করেছি—পাশের সব ভদ্রলোকেরাও দেখেছে শ্যামবাজারের টিকিট করতে। কি ভাববে বল তো?—উঠলেই কণ্ডাক্‌টার বলবে—'শ্যামবাজার এখানে নয় বাবু।' আর গাড়িসুদ্ধ লোক শ্যামবাজার কোথায় তা বলবার জন্যে হামড়ে উঠবে;—সঙ্গে মেয়েছেলে দেখলে উপকার করবার জন্যে কি রকম হন্যে হয়ে ওঠে সব দেখ নি তো?...."

সেই সংকোচপীড়িতা, ব্রীড়াময়ী 'লেডি'!

এত আপীল-উপরোধের পর আবার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "কণ্ডাক্‌টারকেই খুশি কর তা হলে।"

যুবক বিপন্নভাবে একবার এদিক-ওদিক চাহিল; অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি যে করি! মেডিকেল কলেজ এসে পড়ল এদিকে!"

আমিও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। আদ্যোপান্ত শুনিয়া উদ্বিগ্ন না হইয়া গতি ছিল না। আহা! আর বোধ হয় দুটো মিনিট, তাহার পরই সংসারের ভাণ্ডার থেকে অতি কষ্টে অপহৃত এই কয়টি ঘণ্টা একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ওদের ওভারটুন হলে আর মন নাই। যুবকের বোধ হয় সংকোচ কিন্তু তাহার সঙ্গিনীর মন যে সত্যই মুক্তপক্ষ হইয়া উধাও হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাড়ির তুলনায় ওভারটুন ছিল মুক্তি, কিন্তু দমদমার কাছে তাহাই হইয়া পড়িয়াছে পিঞ্জর।

দুইটি মিনিট, ওদের আজকের দিনের চরম কথাটি এই সময় কণিকাটুকুরই মধ্যে।...কোন উপায় নাই?

এই সময় সামনে একটা রিক্‌শ বাঁচাইতে ট্রামের হঠাৎ ব্রেক দেওয়ায় সবাই যেন হোঁচট খাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। আমি কাগজসুদ্ধ যুবকটির বেঞ্চের পিঠে গিয়া পড়িলাম। নিজেকে সামলাইতে হাতের কাগজটা তাহার পাশে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। যুবক উঠিয়া বসিয়া কাগজটা আমার হাতে তুলিয়া দিল ; একটু যেন সন্দেহের সহিত আমার চোখের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি হানিল। আমি কাগজটা লইয়া সহজভাবে বলিলাম, "থ্যাংক্‌স্।"

আবার না-পড়ার পড়া শুরু হইল।

ট্রাম আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যুবক কতকটা নিজের মনে কতকটা সঙ্গিনীকে শুনাইয়া বলিল, "যদি একটা খবরের কাগজও হাতে থাকত তাহ'লেও—"

মেয়েটি গ্রীবা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হত তাহ'লে ?"

"তাহলে ঐ জায়গাটুকু—ওভারটুনের সামনে দু'জনে আড়াল হয়ে বসতাম—কাগজের আড়াল দিয়ে। ওরা তো আর ট্রামে উঠে দেখতে আসত না।"

মনে হইল, যেন স্বামী-গরবিনী প্রশংসাদীপ্ত নেত্র তুলিয়া চাহিল। —এটা আমার নিছক কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এর পরের নীরবতাটুকুতে যেন এই ছবিই ফুটিয়া উঠিল। অন্তত সে যে ঘুরিয়া বসিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না আমার।

একটু পরে শুনিলাম, "খবরের কাগজ তো রয়েছে।"

"কই ?"

"পেছনে।"

"ধ্যেৎ, চাওয়া যায় কখন ?"

মেয়েটি ঘেঁষিয়া আসিল। আরও নিম্নকণ্ঠে বলিল, "এক উপায় ঠাউরেছি ; কিন্তু তুমি যা মেয়ে-মুখো ? আমি শুনিয়ে শুনিয়ে তোমায় জিগ্যেস করি, 'কোয়ালেশ্যন মিনিস্ট্রি ফরম্ করবার কি হল, বলতে পার ?' তুমি বলবে 'না, আজকের কাগজটা মোটেই পড়া হয় নি, অথচ ভয়ানক আগ্রহ জেগে রয়েছে।'—তা হলেই ভদ্রলোক

ভদ্রতা ক'রে কোন্ না কাগজটা একবার বাড়িয়ে দেবেন।—আদ্ধেক পড়ে অমৃতবাজারটা যদি না ফেলে আসতে তাড়াতাড়ি।—তাহ'লে আমি শুরু করছি। (প্রকাশ্যকণ্ঠে) "আচ্ছা কোয়ালি—"

যুবক একরকম শিহরিয়া উঠিয়া তাহার বাম হাতটা চাপিয়া ধরিল, চাপা ত্রস্তস্বরে বলিল, "না না, না, নহু, ছিঃ।"

আবার সেই ব্রীড়াময়ী 'লেডি'!

ট্রাম কলেজ স্কোয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নীরব অসহায় উদ্বেগ!

আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম না। মাথায় একটি মতলবও আসিয়াছে, কিন্তু দারুণ দ্বিধায় মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আর কিন্তু সময় নাই, এর পরের স্টপেজ একেবারে ওভারটুন হলের সামনে।

আমি কাগজটি সীটে রাখিয়া দিয়া বেশ জানান্ দিয়া সাড়ম্বরে উঠিয়া পড়িলাম। দরজার দিকে পা বাড়াইতে একটি মারোয়াড়ী ভদ্রলোক বলিলেন, "বাবুজী, আপনার অখ্‌বার প'ড়ে রইল যে!"

আমি ঘুরিয়া দেখিলাম। পলক মাত্রের দ্বিধা, তাহার পর বিমূঢ়দৃষ্টি যুবকটিকে দেখাইয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, "না কাগজটা ওঁর; পড়তে নিয়েছিলাম!"

ফল কি হইল, আর ফিরিয়া না দেখিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।